৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ

সম্পাদনা
তপন কুমার দে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭মার্চের ভাষণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা। এটি শুধু আমাদের জাতীয় ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও স্থান দখল করে আছে। উক্ত ভাষণকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদরা বিশ্বের দুই তিনটি শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে একটি বলে মন্তব্য করেন। আব্রাহাম লিংকন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ভাষণের সাথে তুলনা করেছেন বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণকে। অনেকেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিকে অন্য দুই নেতার ভাষণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করেছেন। ভাষণ সম্পর্কে যে যাই বলুক বা মন্তব্য করুক, ভাষণে ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা। এই ভাষণকে অনেকে বলেন স্বাধীনতার ঘোষণা। এ ধরনেরই মন্তব্য বা মূল্যায়ন করেছেন পন্ডিত ব্যক্তিরা। আর সেই সব পন্ডিত ব্যক্তি বা সুধীজনদের লেখা প্রবন্ধ ও সাক্ষাতকার সংগ্রহ করে সম্পাদনা করা হয়েছে '৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ' .নামক গ্রন্থটি। গ্রন্থটির লেখাগুলো পাঠক সমাজকে ধারণা দিবে ৭ মার্চের ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের যোগসুত্র সম্পর্কে।
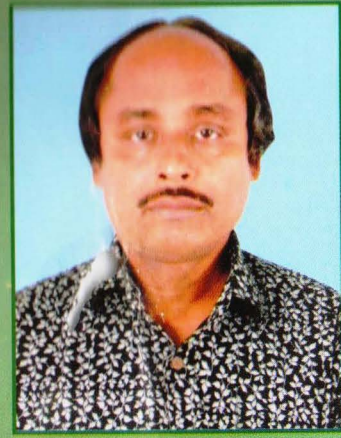
তপন কুমার দে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার হিংগানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম পঞ্চানন্দ দে এবং মাতার নাম উষা রাণী দে। তিনি স্কুল জীবনেই ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। রাজনৈতিক কারণে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় দুই বছর বন্দী থাকার পর ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করেন। কারাজীবনের পর তিনি পুনরায় লেখা পড়া শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর লেখালেখিতে মনোযোগ দেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ: (১) মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল (২) মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ (৩) মুক্তিযুদ্ধে ৪নং সেক্টর ও মে.জে. সি.আর. দত্ত বীরউত্তম (৫) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা (৬) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা (৭) একাত্তরের কথা (৮) আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ (৯) বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ (১০) একাত্তরের গণহত্যা ও রমনা কালী মন্দির (১২) গণহত্যা একাত্তর (১৩) নারী মুক্তি আন্দোলনের খণ্ডচিত্র (১৪) একাত্তরের বীর বাঙালি (১৫) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ (১৬) বাঙালি বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু (১৭) বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা (১৮) বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাস্টারদা সূর্য সেন ও বীরকন্যা প্রীতিলতা (১৯) বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবন কথা (২০) বাংলাদেশের মঠ মন্দির (২১) স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা (২২) বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের কথা (২৩) গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে (২৪) আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা (২৫) বাংলাদেশের কয়েকটি জনগোষ্ঠী (২৬) স্বাধীনতা ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু (২৭) রক্তাক্ত ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ
সম্পাদনা : তপন কুমার দে

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০

তাম্রলিপি-১২৪

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আবু হাসান

কম্পোজ
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এম. আর. প্রিন্টিং প্রেস
১১, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০

---

7 Marcher Vashon O Muktijuddha
Edited by : Tapan Kumar Dey
First Published : February 2010, by A K M Tariqul Islam
Tamralipi, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 200.00

ISBN : 984-70096-0124-8

উৎসর্গ

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী
জগজিৎ সিং অরোরা
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ৭ মার্চের ভাষণের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষণ ইতঃপূর্বে কোনো নেতা দিয়েছেন বলে জানা নেই। ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট অমর হয়ে থাকবে।

৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে সভার আয়োজন চলছে। সবার আশা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। ৬ মার্চ টিক্কা খান ঢাকায় পৌঁছলে তাকে শপথ পড়ানো হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন সেনাবাহিনী দিয়ে সভা স্তব্ধ করে দেয়া হবে; কিন্তু তাতে আন্দোলন থামবে না। তাই সামরিক বাহিনী সভা বন্ধ করতে সাহস পায়নি।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ৭ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু কী ভাষণ দেবেন তা নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষজ্ঞরা তাঁর ভাষণ লিখে দেন। বামপন্থী ও ছাত্রলীগের চরমপন্থীরা স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে চাপ দিচ্ছিলেন। ৭ মার্চ দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর জ্বর ছিল। তিনি গভীর চিন্তা করলেন– তিনি কী বলবেন্। তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের রাজনীতির আলোকে নিজের চিন্তা থেকে তিনি ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করেন। ৭ কোটি মানুষের নেতা তিনি। তাদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে জাতির সঙ্কটকালে তিনি যে ভাষণ দেবেন তা জাতিকে আগামী দিনে সঠিক পথ দেখাবে।

সকাল থেকেই হাজার হাজার লোক মিছিল করে জমায়েত হতে থাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সবার হাতে বাঁশের লাঠি। গ্রামের কৃষক নৌকার মাঝি, মিলের শ্রমিক থেকে শুরু করে ছাত্র জনতা সবাই জড়ো হতে থাকে। সবার কণ্ঠে এক আওয়াজ বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।

দুপুর হতে না হতেই সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান লোকারণ্য হয়ে যায়। হিসেব করার উপায় নেই লোক কত হবে। কেউ বলে দশ লাখ, কেউ বলে পনের লাখ, আবার কেউ বলে বিশ লাখ। সারা মাঠ জুড়ে শুধু মানুষের মাথা আর বাঁশের

লাঠি। মানুষ গোনার যো নেই। সময় বয়ে যায়। সবার মাঝে উৎকণ্ঠা কখন নেতা আসবেন? কী বলবেন আজ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিব? জাতিকে কী দিক নির্দেশনা দেবেন শতাব্দীর মহাপুরুষ জাতির পিতা শেখ মুজিব? উৎকণ্ঠায় সবাই। কারণ ১লা মার্চ যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন তখন ছাত্রসমাজ আর বসে থাকেনি। সেই মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে উত্তোলন করা হলো স্বাধীন বাংলার পতাকা। সবুজ জমিনের মাঝে লাল সূর্য। সূর্যের মাঝে হলুদ বর্ণের বাংলাদেশের মানচিত্র।

৩ মার্চ পল্টন ময়দানে লক্ষ জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলার ইশতেহার ঘোষণা করা হলো। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতাটি হলো আমাদের জাতীয় সংগীত। যদিও বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) জনসভায় দিকনির্দেশনা দিবেন জানিয়েছিলেন তবুও নেতাকর্মীদের উৎকণ্ঠা ছিল একটু বেশি।

অবশেষে নেতা এলেন। নির্দিষ্ট সময়েই এলেন তিনি। দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে মঞ্চে উঠলেন। লাখ লাখ জনতা "জয় বাংলা" আর "তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব" স্লোগানে অভিবাদন জানালেন তাঁকে। তিনি একবার তাকালেন চারদিকে। তারপর তাঁর স্বভাবসুলভ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে শুরু করলেন, "ভায়েরা আমার.... । কী তেজ সেই কণ্ঠে! একে একে দিতে শুরু করলেন বিভিন্ন দিকনির্দেশনা। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার ছেলে খাঁটি বাংলায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন "আমাদের আর দাবিয়ে রাখবার পারবা না" জনতাকে বললেন তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" দিলেন অসহযোগের ডাক। সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের বর্জন করতে হবে। সবশেষে বললেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" একটি ভাষণে সবকিছু বলে দিলেন তিনি। একথা বললেন না যে আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তা হলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটা হতো হটকারী সিদ্ধান্ত। পাকিস্তানিরা সরাসরি বঙ্গবন্ধুর ওপর বিচ্ছিন্নভাবে দোষ চাপিয়ে দিত। তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগুচ্ছিলেন বলেই সত্তরের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন। তাই তিনি স্বাধীনতার ডাক দিলেন। সমগ্র জাতিকে বলে দিলেন আমাদের এবারের স্বাধীনতার সংগ্রামে "তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।" তোমাদের নিজস্ব শক্তি দিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। কী সেই কণ্ঠ! কী অপূর্ব সেই বাণী! একবার মনে হয়েছে এক বিপ্লবী কবি এসে জাগরণের কবিতা শোনাচ্ছেন সমগ্র জাতিকে। আবার মনে হয়েছে বাংলার

রাখাল ছেলে শেখ মুজিব হ্যামিলনের বংশীবাদক হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে। এমন ভাষণ কী হয়েছে আর কোনোদিন? কেউ কি শুনেছে? একদিকে লড়াইয়ের ডাক, অপরদিকে অসাম্প্রদায়িকতার আহ্বান। বলা হয়েছে বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ যারাই আছে কারো কোনো ক্ষতি যাতে না হয়। "আমাদের যাতে বদনাম না হয়।" শুধু কি তাই তাঁর ভাষণে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার ওপর কী অগাধ বিশ্বাস! বললেন, "এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিটি কথা ছিল অর্থবহ। জাতিকে দেয়া এক দিক নির্দেশনা। এ ভাষণের পর আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের কী করতে হবে। একে একে সবকিছু সাজিয়ে বলে দেয়া হয়েছে এ ভাষণে। তাই ৭ মার্চের ভাষণ শুধু ঐতিহাসিক নয়, এ ভাষণ হলো বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকে তাঁর নির্দেশে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন। তারপর থেকে তিনি কার্যত গোটা পূর্বপাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন।

৮ই মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাসহ সকল শহর-গঞ্জে সরকারি অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ করে দেয়। কেবল অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানমূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, পানি-বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিকেল, ক্লিনিক খোলা রাখা হয়। লক্ষণীয় ছিলো যে, জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করায় সরকারের পুলিশ বাহিনী ও ই.পি.আর-এর বাঙালি সদস্যবৃন্দের অনেকে পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক, প্রকৌশলী, আইনজীবী ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোকজন, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সংগঠন বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে জয়বাংলা ধ্বনি তুলে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করতে থাকেন।

৭ মার্চের ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি নেতার নির্দেশিত পথে সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা সংগ্রাম পরিষদ এবং সেই সাথে পরিচালিত হয় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। ২৫ মার্চ পর্যন্ত সর্বত্র চলে প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি। যার জন্য ওইদিন রাতে পাকিস্তানিদের আক্রমণের সাথে সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় বাংলার বীর সন্তানেরা। আর ওই প্রতিরোধের মুখে বহুস্থানেই প্রাথমিক পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যা

পাক সামরিক জান্তা ভাবতেই পারেনি। কারণ তাদের ধারণা ছিল কিছু নেতা ও কর্মী সমর্থকদের হত্যা করলেই আওয়ামী লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং সারা বাংলা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। কিন্তু তাদের সে ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে দেয় বাংলার দামাল সন্তানেরা। গেরিলা আক্রমণে তারা ভণ্ডুল করে দেয় খুনি ইয়াহিয়া, ভুট্টো, নিয়াজি, টিক্কা খানের দম্ভোক্তি। কারণ তারা বলেছিল কিছু লোককে হত্যা করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান বিপদমুক্ত হবে। কিন্তু পাকিস্তান বিপদমুক্ত হয়নি বরং তা খণ্ড হয়ে যায় এবং জন্ম নেয় নতুন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করে এবং বাংলার মাটি থেকে হানাদার মুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধারা। কাজেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে তাকালে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে এবং ২৫ মার্চ রাতে প্রতিরোধের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হয়। এসব দিক বিবেচনা করেই বলা যায়, ৭ মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের শুভ সূচনা করে। অবশ্য ৭ মার্চের ভাষণকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন করেন। অনেকেই বলেছেন ৭ মার্চের ভাষণই স্বাধীনতার ঘোষণা। এ ধরনের মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন পণ্ডিত। ওই সমস্ত পণ্ডিত এবং সুধিজনদের লেখা সংগ্রহ করে সম্পাদনা করা হয়েছে '৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থটি। এটি পাঠ করে পাঠকসমাজ ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে। সেই বোধ থেকেই ৭ মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করবে এ প্রজন্ম। '৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সুধিজনের পরামর্শ, লেখা নেয়া হয়েছে। প্রথমেই তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা থেকে এ লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে ওই সমস্ত পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকদের নিকট।

গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য কয়েকজন সুধীব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। তাদের কাছেও আমি কম ঋণী নই। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার বিপণন শাখার সহকারী পরিচালক ভবরঞ্জন চক্রবর্তী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির টেকনিক্যাল অফিসার মীর তাহাজ্জত আলী অঞ্জু। গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রকাশনা জগতে তরুণ ও উদীয়মান ব্যক্তিত্ব 'তাম্রলিপি'র স্বত্বাধিকারী এ কে এম তারিকুল ইসলামের নিকট ঋণ স্বীকার না করে পারছি না।

তপন কুমার দে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ভায়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস—এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম,

১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করি।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান—কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার

মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি বলে দিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।

এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন-মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।

আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল—কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না।

২৮ তারিখ কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং

জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।

সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না।

শোনেন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ থেকে আটত্রিশ বছর পূর্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে অমানবিক নিয়ম-কানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণে।

প্রতিমিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচার তত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। একহাজার একশত সাতটি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই—আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।

ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে—There is nothing like a good beginning for a speech. বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগতত্ত্বে যা বলা হয় (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এ যুগান্তকারী ভাষণে।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা—যা পুরো বক্তৃতার মূলভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতাকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে।

পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ মার্চের এ বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধস্লোগান। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেতো এ বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে উচ্চারিত বক্তৃতা সাড়ে সাতকোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণই ছিল কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

জনযোগাযোগে যেসব speech idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে বক্তৃতায়। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলার জনগণের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ এই বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ সাবলীল ভাষায় তাৎক্ষণিক রচিত এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি। কী অন্যায় করেছিলাম? কি পেলাম আমরা? কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? ...বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধন সৃষ্টিতে ধ্বংস question and then answer পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। পুরো ভাষণে বর্তমানকালের যৌক্তিক বাবহার বক্তৃতাটিকে সজীবতা দিয়েছে। আবার কথোপকথনের ধারার স্বার্থে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এ বক্তৃতায়।

বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে । বহু গবেষণার পর যোগাযোগতাত্ত্বিকদের declarative বাক্য সংক্ষিপ্ত করার বর্তমান নির্দেশিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যথাযথ প্রতিফলিত। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, "২৮ তারিখ কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। সরকারি কর্মচারীদের বলি—আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না।"

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যাঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিতি করানোই নয়, বরং তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তার এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহমূলক বক্তব্য—"তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু—আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।" সাড়ে সাতকোটি বাঙালি এ বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিল। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিক উদারতার কোনো হেরফের কখনও যে ঘটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্ম-মৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি "আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব" বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন, "তোমরা আমার ভাই—তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।" কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান, উদার-হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যথাযথ তথ্যচয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর তীক্ষ্ণ যুক্তিবিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনাসঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, "আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য—আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্তমানুষের মধ্যে। তার বুকের ওপর গুলি হচ্ছে। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।" সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এক সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় আজকাল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যরকমভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত। যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, "তাকে আমি বলেছিলাম জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, অপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার পরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষ হত্যা করা হেয়ছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।"

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গেলেও বঙ্গবন্ধু put up the attribution first-এর নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করে তারপর তার মন্তব্য/বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। যেমন—"ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না" কিংবা "ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম" ইত্যাদি। সার্বজনীন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ (agenda setting function) যা বঙ্গবন্ধুর এ বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে বারবার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদানকালেও বঙ্গবন্ধুর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে কোন তারতমা ঘটতো না—তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য :

"আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, ফৌজদারি আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যানা জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হয়তাল, কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না।"

জনযোগাযোগে ব্যক্তি বা ঘটনার মর্যাদা আরোপণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশে এ বিধানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—তিনি বলেছেন—'আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন" কিংবা "আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব"।

সার্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফললাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপনের (posing a challenge) প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত একটি পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে যখন বলেন, "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরও দেব—এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ"—তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগবিদ্যার শিল্পকুশল প্রণালীতে পরম দক্ষতায় কিভাবে শ্রোতাদের বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন। যেকোনো বক্তৃতার সংজ্ঞানির্ধারণী অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে

যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষবাক্য "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা—যা ৭ মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত। যে প্রক্রিয়ায় তিনি ভাষণ শেষ করেছেন তা যোগাযোগবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সাথে হুবহু মিলে যায়। যেখানে বলা হয় 'don't drag out your condlusion' আমরা পরিশেষে বলছি—একটি কথা বলে শেষ করছি বা পরিশেষে এ কথাটি না বললেই নয় ইত্যাদি ভূমিকা করে বক্তব্য শেষ করি। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি speech definition- এ প্রবেশ করেছেন—যা আধুনিক তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ এবং যা ছিল আটত্রিশ বছরর পূর্বে অকল্পনীয়।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪০ সালের ৪ জুন তার বক্তব্যে বলেছিলেন, We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender " Lnvwfb we shall fight ছিল বক্তৃতার সংজ্ঞা।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সংজ্ঞা অংশ ছিল 'I have a dream' উক্ত বক্তৃতার একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ : "I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal, I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character".

আমরা জানি যে, বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হয়। একাত্তরের ৭ মার্চ তারিখে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তট-অতিক্রমী ভাষণ তেজস্বী বক্তৃতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল—তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বর সংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে

উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। সার্বজনিক বক্তৃতাবিশারদ, গবেষক ও যোগাযোগবিদদের জন্য এ ঐতিহাসিক ভাষণ একটি আবশ্যিক পাঠক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। আমাদের প্রত্যাহিক চিন্তা-চেতনা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলিত ও স্বচ্ছ উপস্থাপনা সার্বজনিক ... public uddness-এ অন্যতম শর্ত।

এ প্রসঙ্গে ডেল কার্নগীর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'The best argument is that which seems merely an explanation' অর্থাৎ সর্বোত্তম যুক্তি হচ্ছে শুধুই সঠিক ব্যাখ্যা। তৎসময়ের ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এ ভাষণটিকে সব সময়ের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

সাত মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দচয়নে মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোনো টীকা বা নোট ব্যতিরেকে ছেদহীনভাবে এমন নির্মেদ ও নির্দেশনামূলক ও একই সাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইক তখনই বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদনিবন্ধে। এ বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনমতা। শব্দের এমন সুপ্রযুক্ত ব্যাবহার সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) বিখ্যাত উক্তি : "The most valuable of all talents is that of never using two words when one will do" আমাদের স্মরণে আসে। ৭ মার্চ একাত্তরের এ ভাষণ বাংলা ভাষায় শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, পৃথিবীর এটি একটি অন্যতম ভাষণ। কারণ এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা।

এ ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত রাখবে, জীবনসত্য অনুধাবনে পথ দেখাবে ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলনকে দেবে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা।

যুগান্তর : ১৫ আগস্ট, ২০০৯

বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন

কে এম সোবহান

৭ মার্চ ছিল বাঙালি জাতির জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন। ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে তথা স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংগ্রাম শুরু করে অনেক আগেই। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনই ছিল এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা। নির্বাচনের রায়ে বাংলাদেশের লোক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠিন মত প্রকাশ করে। নির্বাচনের রায় স্বৈরতন্ত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। স্বৈরতন্ত্র সবসময়ই জনগণের ইচ্ছা পূরণ করে না। সত্তরের নির্বাচনের ফলে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান দেশ বিভাগের পর থেকেই রচিত হচ্ছিল তা আরও পাকা হয়ে গেল। এই অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে সরকারের রূপ ও অন্যানা রাজনৈতিক বিষয়ে বৃহত্তর মতভেদ ছিল। এই অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক মতের সঙ্গে পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। এখানকার জনগণ গণতন্ত্রের জন্য তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য, ভাষার জন্য, সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম করছিল দীর্ঘকাল থেকে। বাংলার মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে। সে সব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় '৪৭-এর আগস্ট মাস লেকেই। ছাত্র, প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কোনো কোনো রাজনৈতিক দল এ সব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অনেক নির্যাতন ও শাসন করেও সে সব আন্দোলন বন্ধ করতে পারেনি। এ সব আন্দোলন ও সংগ্রামের মূল সূর ছিল গণতন্ত্রের পক্ষে এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে ছাত্র, জনতা, কৃষক, মজুর, রাজনৈতিক কর্মীর আত্মাহুতি কিন্তু সংগ্রামকে কাবু করতে পারেনি। কখনও হয়ত থমকে গেছে কিন্তু আবার সেই ফেলে আসা সূত্র ধরে আন্দোলন শুরু হয়েছে।

এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে। শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এই মামলা আরম্ভ।

তাদের ধারণা ছিল যদি এই মামলায় শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গীদের চরম শাস্তি দিতে পারে তাহলেই তাকে যারা "বিচ্ছিন্নতাবাদী" আন্দোলন বলতো, তার ইতি হবে। সকল ব্যবস্থাও করা হয়েছিল তার জন্য। মামলার বিভিন্ন লক্ষ্য ছিল— এই লক্ষ্যের মধ্যে একটি ছিল বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। সেই কারণে মামলার ট্রাইব্যুনালে ঢাকা হাইকোর্টের দু'জন বাঙালি বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চেয়ারম্যান হিসেবে থাকেন পাঞ্জাবি বিচারপতি। মামলা করার ফল উল্টো হয়ে গেল। সমস্ত বাংলা ফুঁসে উঠল এই ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে। ছাত্র আন্দোলন চরমে পৌঁছালে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয় এই মামলা তুলে নিতে ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে। আইয়ুব খান চেষ্টা করেছিল শেখ মুজিবকে বাংলার স্বাধিকারের বিরুদ্ধের যুক্তিকে গ্রহণ করাতে। গোল টেবিল বৈঠক থেকে শেখ মুজিব বেরিয়ে আসেন। তার ছয় দফা থেকে তিনি বিন্দুমাত্রও সরে আসতে অস্বীকৃতি জানান।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল হয়ে গেলে শেখ মুজিব বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে সমস্ত পাকিস্তানে স্বীকৃতি পান। এই ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম আরম্ভ তা পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনেও বিভেদ সৃষ্টি হয়। বাংলার বেসামরিক প্রশাসনের ওপর ছয় দফার প্রভাব প্রচণ্ড ভয় হতে থাকে। বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের ওপর এর প্রভাব কতখানি পড়েছিল তার কোনো আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। যদিও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের কয়েকজনকে আসামী করা হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য যাঁরা সামরিক বাহিনীতে ছিলেন তারা পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় চট্টগ্রামে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঘটনাবলী থেকে। বেসামরিক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলার ন্যায্য দাবির পিছনে। এর ফলে পাকিস্তান সরকার বাংলার বেসামরিক প্রশাসনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। প্রশাসনও একধরনের অসহযোগিতা দেখাতে থাকে।

১ মার্চ একাত্তরের পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে শেষ যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। বাংলার স্বাধীনতা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাংলার প্রশাসনে সাড়া দেয় এবং পূর্ণ অসহযোগিতা দেখাতে থাকে। তবে কিছু বেসামরিক কর্মকর্তা পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে। প্রশাসনের অসহযোগিতার ফলে পাকিস্তান সরকারের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, প্রথম পথ ছিল বাংলার যে সব দাবি বঙ্গবন্ধু করেছিলেন তা মেনে নেয়া। দ্বিতীয় ওই সব দাবি অগ্রাহ্য করে বাংলার ওপর দমননীতি চালিয়ে যাওয়া। পাকিস্তান সরকার

এই দমননীতি চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। ছাত্র রাজনীতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার কথা বলে আসছিল মার্চের প্রথম থেকেই। ৭ মার্চের মধ্যে এটা অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল বাংলার মানুষ কী চায়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার ভাষণ। তিনি তার ভাষণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। সম্মুখ যুদ্ধের জন্য দুর্গ গড়ে তোলার কথা বলেন। যার যা অস্ত্র আছে সে সব নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেন।

তিনি একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে ছাত্র-জনতার উদ্দেশে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বাংলার মানুষকে সম্মুখযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ৭ মার্চের ভাষণের শেষপর্বে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। এই ঘোষণার মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের কথা বলা হয়, বলা হয় অর্থনৈতিক মুক্তির কথা, বলা হয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। স্বাধীনতার যুদ্ধ, ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় আরম্ভ হয় তখনই, যখন একটি দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে দখলকারী শক্তির বিরুদ্ধে। সেই ঘোষণাই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। এই ঘোষণার পর যেটা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে, দখলকারী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করা, যা আরম্ভ হয়েছিল ২৫ মার্চের রাতে পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এই আক্রমণের উত্তর দেবার কথা বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ ইপিআর অয়্যারলেসের মাধ্যমে তাঁর পার্টির লোকজনদের বলেন। তিনি জানতেন তাকে বন্দি করা হবে, এমন কি হত্যাও করা হবে। তাই ৭ মার্চে তিনি বলেছিলেন যে তিনি যদি নাও থাকেন, তাও বাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে।

সেই ৭ মার্চ
মুনতাসীর মামুন

মার্চ এলেই স্বপ্নেরা হানা দেয়। আমি আমার বন্ধুরা প্রতিবছর এ মাসেই ১৯৭১-এর মার্চে ফিরে যাই। ১৯৭১-এর পর আমাদের বয়সের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো অনেকগুলি বছর। তরুণ যুবা পরিণত হয়েছি মধ্যবয়সীতে, কিন্তু মার্চ এলেই মনে হয় ফিরে গেলাম ১৯৭১-এর সেই মার্চে। মার্চ এলেই আমি স্মৃতি জাগরূক করতে চাই, যে স্মৃতিকে গত দু-দশক শাসকরা মুছে দিতে চেয়েছে। দুঃশাসনের মূল স্ট্র্যাটেজিই হলো স্মৃতি মুছে দেয়া।

মার্চ আমাদের জন্য স্বপ্ন দেখারও মাস। এ মাসেই আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ জয়ের। আর এই মার্চের অনেক ঘটনাবলি থেকেই শক্তি আহরণের চেষ্টা করি বর্তমানকে খুঁজবার জন্য। স্মৃতি জাগরূক রাখি আর দেখি, বর্তমানের প্রতিবন্ধকতা কিছু নয়, আমরা এগুচ্ছি জয়ের দিকে।

১ মার্চ ১৯৭১। ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা চলছে বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের। ক্রিকেট খেলা। স্টেডিয়াম প্রায় ভর্তি। চাপা টেনশন থাকলেও শহর শান্ত। বেলা একটার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার-ভাষণ দিলেন যার মূল কথা ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত। বেতার ভাষণটি শেষ হতে-না-হতেই পুরো শহরটি বদলে যেতে লাগল। যেন আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে শহর। 'ইত্তেফাক' থেকে আমরা কজন বেরিয়েছি রাস্তায়। এরি মধ্যে বেরিয়ে গেছে ছোট ছোট মিছিল; যাচ্ছে গুলিস্তান, পল্টন, পূর্বাণী হোটেলের সামনে। মিছিল আর স্লোগান জয়বাংলা... তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা—জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা...

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পণ্ড। খেলোয়াড়রা দৌড়ে আশ্রয় নিয়েছে ড্রেসিংরুমে। স্টেডিয়ামের রাস্তায়। হোটেল পূর্বাণীর সামনে লোকে-লোকারণ্য। বিকাল তিনটায় সেখানে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক। বঙ্গবন্ধু ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত হতে বলে দুদিনের কর্মসূচি দিলেন আর বললেন, ৭ মার্চ

হবে জনসভা। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্য দেবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির স্থপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার পর বলেছিলেন, '১ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন।'

১ থেকে ৭ মার্চ প্রতিদিনি কিছু-না-কিছু ঘটতে থাকে ঢাকা শহরে, সারাদেশে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-জনতার সামনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ আর গগনবিদারী স্লোগান : 'জয় বাংলা', জ...য়...বা...ং...লা'। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফ্যু। মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর রাস্তায় নেমে; মানুষ বলে, 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা' আর কার্ফ্যু ভাঙে; মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর গুলি খায়। আবারও বলে 'জয় বাংলা', আবারও গুলি খায়। হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে আর গভীররাতে শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল হতে আপনারাও রেহাই পাবেন না। ...সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবিলা করবেন না।'

একাত্তরের ৩ মার্চ, আগের রাতের শহীদদের নিয়ে মিছিল বের হয়। পল্টনে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন : 'গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান তাহলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করব।' 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে পল্টনের চারদিক।

শেখ মুজিব বললেন, 'বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয়, রাষ্ট্র চালানোর জন্য—গুলি খাওয়ার জন্য নয়। গরীব বাঙালির টাকায় কেনা বুলেটের ঘায়ে কাপুরুষের মতো গণহত্যার বদলে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন। ...২৩ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে আবার বুকের রক্ত দেব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বীর শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করব না।' বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, 'ভায়েরা আমার, আমি বলছি আমি থাকি আর না-থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন। তাঁরাই নেতৃত্ব দেবেন। আর যদি কেউ না থাকে, তবু আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি বাঙালিকে নেতা হয়ে নির্ভয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।' চারদিক থেকে গগনবিদারী গর্জন শোনা যায় : 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা'।

রাতে সারাদেশের মানুষ কার্ফ্যু ভেঙে নেমে আসে রাস্তায় আর বলে 'জয় বাংলা', খালিবলে 'জয় বাংলা'। ৭৫ জন লাশ হয়ে পড়ে থাকে রাস্তায়, অগণিত মানুষ কাতরায় গুলি খেয়ে, তবুও বলে 'জয় বাংলা'।

৭ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধু চিৎকার করে বলেছে, 'জয় বাংলা', আর বদলে পেয়েছে গুলি! আমরা ভাবছি কী বলবেন শেখ মুজিব? তিনি কি বলবেন বাংলাদেশ হয়ে গেছে স্বাধীন? কিন্তু বলার আর বাকি কী? বরং তিনি যদি না বলেন, তাঁকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে মানুষ। ইতোমধ্যে উত্তোলিত হয়েছে স্বাধীনবাংলার পতাকা আর বাংলাদেশ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে সেই গগনবিদারী আওয়াজে– 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা'।

ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, ৭ মার্চ শেখ মুজিব কী বলবেন তা ঠিক করার জন্য ৬ মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা। 'সারা দেশে প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল যে, ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত, ছাত্র ও যুবসমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে, ছাত্রসমাজ, যুবসম্প্রদায় এবং রাজনীতি-সচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোনোকিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।'

সুতরাং দল ও দলীয় নেতা শেখ মুজিবের ওপর দায়িত্ব এসে পড়েছিল এমন কিছু না বলা, যা পাকিস্তানি পক্ষকে তখনই অজুহাত দেবে অপ্রস্তুত জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। আবার একই সঙ্গে চাঙ্গা রাখতে হবে আন্দোলন ও জনগণকে। এ ভারসাম্য বজায় রাখা নিতান্ত সহজ ছিল না। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে তখনও তাঁকে কাজ করতে হচ্ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে যেখানে তাঁর অবস্থান ছিল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এখন আমাদের কাছে ব্যাপারটি যত সহজ মনে হচ্ছে তখন নিশ্চয় তা ছিল না। এছাড়া ছিল তরুণ বিশেষ করে ছাত্রদের প্রবল চাপ। তারাই ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ফেলেছেন। আন্দোলনের তারাই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। তাদের বিরূপ করা সম্ভব ছিল না।

৬ মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটিতে আলোচনার পর, লিখেছেন ড. কামাল হোসেন: 'বিবেচনা করে দেখা হলো যে, যদি আন্দোলনের জোয়ার ধরে রাখা এবং জনগণের ঐক্য জোরদার করা যায়, তাহলে ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, পরদিন খোলাখুলি স্বাধীনতা ঘোষণার অবস্থান নেয়া হবে না। ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হবে এবং ওইসব দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।'

৭ মার্চ দুপুর থেকে ঢাকা শহরে মানুষ এগুতে থাকে রমনা রেসকোর্সের দিকে। মনে আছে রেসকোর্সের এককোণে আমি, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রফিক নওশাদ বিক্রি করছি সারারাত ধরে ছাপা লেখকদের মুখপত্র 'প্রতিরোধ'। যার হেডলাইন : 'আপসের প্রস্তাব আগুনে জ্বালিয়ে দাও' এরকম একটা কিছু। পরে ৭ মার্চ সম্পর্কিত বিবিসির ভিডিও দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। রেসকোর্সের একদিকে স্লোগান– 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', তো অন্যদিকে– 'পাঞ্জাব না বাংলা– বাংলা বাংলা'। হয়তো মাঝখানে–'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। তো অন্য কোথাও 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব।' মঞ্চের সামনে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' কিন্তু তখনই কেউ বলে ওঠে 'জয় বাংলা' তখনই নদীর ঢেউয়ের মতো সেই ধ্বনি ছড়িয়ে যেতে থাকে আর চারিদিকে কাঁপিয়ে সেই অমোঘ শব্দটি উচ্চারিত হয়– 'জয় বাংলা'।

দুপুর তিনটার মধ্যে লোকে-লোকারণ্য। রেডিও পাকিস্তানের ও পাকিস্তান টেলিভিশন এখনকার মতো তখনও ছিল সরকারি। শেখ মুজিব জেনেশুনেই বলেছিলেন– 'মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমার কথা না শোনেন তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।'

রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারের বন্দোবস্ত করল। পাকিস্তানি সেনা-অফিসার সিদ্দিক সালিক লিখেছেন : 'রেডিওর ঘোষকরা আগে থেকেই রেসকোর্স থেকে ইস্পাত-দৃঢ় লক্ষ দর্শকের নজিরবিহীন উদ্দীপনার কথা প্রচার করতে শুরু করল।' সালিক আরো লিখেছেন, এই ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর হস্তক্ষেপ করে এই 'বাজে ব্যাপারটি' বন্ধের নির্দেশ দিল। সালিকও তা রেডিও কর্তৃপক্ষকে জানালেন। আদেশটি শুনে টেলিফোনের অপরপ্রান্তে বাঙালি অফিসারটি বললেন, 'আমরা যদি সাড়ে সাত কোটি জনগণের কণ্ঠ প্রচার করতে না পারি তাহলে আমরা কাজই করব না।' এই কথার সাথে সাথে বেতারকেন্দ্র নীরব হয়ে গেল। বাঙালি ওই সময় এ ধরনের সাহস দেখানোর ক্ষমতা দেখিয়েছিল। বারবার তারা শেখ মুজিবের ওপর এই বিশ্বাস স্থাপন করেছিল যে তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না। রেডিওতে ভাষণটি অবশেষে প্রচারিত হয়েছিল।

শেখ মুজিব এসে মঞ্চে উঠলেন। সারা রেসকোর্সে কাঁপিয়ে ঝড়ো হাওয়ার মতো সেই শব্দটি বয়ে গেল– 'জয় বাংলা'। মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম

বীরোত্তম লিখেছেন: "কী যেন জাদুমাখা ছিল এই স্লোগানে। এর ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিধি নিরূপণের ক্ষমতা বুঝি কারো নেই।' গণঅভ্যুত্থানের সময় এবং যুদ্ধকালে এ স্লোগান বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। জীবন বাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এই উক্তি যে-উদ্দীপনা জোগাত তার তুলনা নেই। তাই 'জয় বাংলা' জয়ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ওই দিনের রেসকোর্সের জনসভার একটি চিত্রেও মানুষের আবেগের পরিচয় পাওয়া যায় রশীদ হায়দারের একটি বিবরণে। বিবরণটি খানিকটা দীর্ঘ কিন্তু যারা ৭ মার্চ দেখেনি তাদের বোঝার জন্য এটি প্রয়োজন :

"লাল সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত গাঢ় সবুজ রঙের পতাকা হাতে হাতে উড়ছে হাজার হাজার, বড় পতাকাটি উড়ছে বঙ্গবন্ধু যেখানে ভাষণ দেবেন ঠিক তার উপরে।

এই সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে, বহুলোক এসেছেন তীরধনুক নিয়ে, যেন যুদ্ধ আসন্ন। মানুষ যতোটা মরিয়া হয়ে উঠেছে এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে– এই সময়ে প্ল্যান্ট প্রটেকশনের একটি বিমান জনসভার বেশ উপর দিয়ে উড়ে যায়। লোক ওটাতেই শত্রুসৈন্য আছে ভেবে কেউ কেউ লাঠি ছুড়ে মারে; কারও কারও অনুমান ওটাতে টিক্কা খান আছে...

দেখা গেল মেয়েদের ভিড়ে একজন অশিক্ষিত মেয়ে মনোয়ারা বিবি নিজের রচিত গান গাইছে : 'মরি হায়রে হায়, দুঃখের সীমা নাই, সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরাণ ফাইরা যায়।' দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি গানও শোনায় মনোয়ারা বিবি। দেখা যায় গত কয়েকদিনের দুঃখজনক ঘটনা সম্বলিত হাতে-লেখা পত্রিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলেজের ছাত্র সৈয়দ আজিজুল হক, দেখা গেল বাপের কাঁধে দুই-তিন বছরের শিশু বিশাল জনসমাগম দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।"

বঙ্গবন্ধু মঞ্চে ওঠেন। শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিবকোট পরনে। আমরা যারা টিএসসি'র মোড়ে তারা দূর থেকে ঝাপসা একটি অবয়ব দেখি। সভার কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। কালো ভারি ফ্রেমের চশমাটি খুলে রাখলেন ঢালু টেবিলের ওপর। শান্ত গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'ভায়েরা আমার! আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন।'

উনিশ মিনিটের ভাষণ লিখিত নয়। কিন্তু একবারও থমকাতে হয়নি। পরে বিবিসির ভিডিওতে ক্লোজআপে দেখেছি আবেগে কাঁপছে তাঁর মুখ, কিন্তু সমস্ত অবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ বোঝা যায় তিনি পিছুবেন না।

৭ মার্চ যিনি রেসকোর্সে ছিলেন না, তাকে বোঝানো যাবে না ৭ মার্চ কী ছিল বাংলাদেশের জন্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ বাঙালি মাত্র-ই জানেন। এই ভাষণের প্রতিটি উক্তিই উদ্ধৃতিযোগ্য। কিন্তু মূল বক্তব্যটি ছিল– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

কঠিন সংকটে এত ভারসাম্যপূর্ণ অথচ আবেগময় বক্তৃতার সংখ্যা বিরল। কিভাবে তিনি তা পেরেছিলেন আজ ভাবতে অবাক লাগে। পাকিস্তানি সৈনিক সিদ্দিক সালিক লিখেছেন :

'বক্তৃতার শেষদিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে-জনতা সাগরের ঢেউয়ের মতো প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্সে ভেঙে পড়েছিল– ভাটার টান ধরা জোয়ারের মতো তারা ঘরে ফিরে চলল। তাদেরকে ধর্মীয় কোনো সমাবেশ তথা মসজিদ কিংবা গির্জা থেকে ফিরে আসা জনতার ঢলের মতোই দেখাচ্ছিল। এবং ফিরে আসছে তারা সন্তুষ্টচিত্তে– ঐশীবাণী বুকে ধরে। তাদের ভেতরকার সেই আগুন যেন নিভিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেই আগুনকে ধাবিত করা যেতো। আমাদের অনেকেরই আশঙ্কা ছিল এরকমই। এই বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দফতরে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দিল। সদর দফতর থেকে টেলিফোনে কথোকপথনকালে একজন উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা জানান যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।'

অনেকে হতাশাও হয়েছিলেন। যেমন তৎকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন। ড. মোহাম্মদ হাননান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থায় থেকেও আমরা ওইদিন রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। সারা শহরে রটে গিয়েছিল যে, শেখ মুজিব আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এবং বড় ধরনের একটা ঘটনা আজ ঘটবে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়ে ফিরে আসি।'

তবে এ ধরনের হতাশ হওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল কম। কম-বেশি সবাই খুশি হয়েছিলেন। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এরকম– সামরিক জান্তা যদি দাবি মেনে নেয় ভালো, না হলে আমরা স্বাধীন হয়ে যাবো। এর কোনো বিকল্প নেই। মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য মানুষ প্রস্তুত হওয়ার সময় পেয়েছিল। চারদিকে প্রস্তুতিমূলক তৎপরতা শুরু হয়েছিল। আন্দোলনে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি এবং ভাষণ বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিএনপির স্বপ্নদ্রষ্ট জিয়াউর রহমান লিখেছেন : '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক 'গ্রিন সিগন্যাল' বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝে উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।'

মঈদুল হাসান লিখেছেন 'সম্ভবত তিন সপ্তাহাধিককালের অসহযোগ আন্দেলনের জোয়ারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় এমন এক মৌল রূপান্তর ঘটে যে পাকিস্তানিদের নৃশংস গণহত্যা শুরুর সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতাই তাদের জন্য অভিন্ন ও একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি আক্রমণের সাথে সাথে অধিকাংশ মানুষের কাছে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঘোষণা হয়ে ওঠে এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ।'

এ ভাষণের পর ঢাকা শহর নয়, পুরো দেশটি বদলে যায়। বাষ্পে-ভরা পাত্রের মতো টগবগ করতে থাকে ৭ কোটি মানুষ। জোরদার হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। শেখ মুজিবের নির্দেশই হয়ে ওঠে সরকারি নির্দেশ। মানুষ তা মানতে থাকে। এমনকি সরকারি প্রশাসনও। লিখেছেন ড. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর "১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো প্রত্যাখ্যান। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে এই প্রতিরোধের সূত্রপাত। শেখ মুজিবুর রহমান একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো প্রত্যাখান, অন্যপক্ষে অসহযোগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রবর্তনের সম্ভাবনা জনমতে সত্যকরে তোলা– এই রণকৌশল শেখ মুজিবুর রহমান ৩৫টি নির্দেশের মধ্য দিয়ে সম্ভব করে গেলেন।" তিনি আরো লিখেছেন "এই বিভিন্ন নির্দেশনার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নীতিমালার নির্দেশ দেন। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জনসাধারণ, এই কর্তৃত্বের স্বরূপ সিভিল ও কর্তৃত্বের অন্তর্গত পুলিশ এবং মিলিটারি। শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনকে রূপান্তরিত হয়ে যান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এক্ষেত্রেই।"

এভাবে সৃষ্টি হয় একটি সমান্তরাল রাষ্ট্রের। সেদিন বিচার করলে ২৫ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি ফর্মাল ডিক্লারেশন মাত্র। আসলে সত্যিকার অর্থে

বাংলাদেশের পত্তন হয় ৭ মার্চ। মহাত্মা গান্ধীও এতো স্বল্পসময়ে এতো পরিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন করতে পারেননি। যারা পিছিয়ে ছিল, এতোদিন ভুগছিল দোদুল্যমানতায়, তারাও এগিয়ে আসতে থাকে। কী জানি কাঁরাভা যদি তাদের ফেলে এগিয়ে যায়। এভাবেই বাংলাদেশ এগুতে থাকে ২৫ মার্চের দিকে। ওই যে সেদিন শেখ মুজিব আঙুল তুলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাঙালি তা মেনে নিয়েছিল। পরাধীন পাকিস্তানে আর তারা ফিরে আসেনি।

সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা

এ বি এম মূসা

ইতিহাসের তিনজন মহানায়কের তিনটি ভাষণের আমি অপূর্ব মিল দেখতে পাই মার্কিন গণতন্ত্রের পথনির্দেশক আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ ভাষণ, বৃটিশ জাতির সংকটকালীন সময়ে উইনস্টন চার্চিলের যুদ্ধকালীন একটি বেতার ভাষণ ও বাঙালি জাতির মুক্তি নির্দেশনা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের সাতই মার্চের উদাত্ত আহ্বান।

লিংকন তার ভাষণটি দিয়েছিলেন গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত আমেরিকানদের জাতি গঠনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়ে, চার্চিল বৃটেনদের জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তিকে প্রতিহত করতে উদ্দীপ্ত করেছিলেন আর বাঙালি জাতির নেতা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য।

আব্রাহাম লিংকন মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পথনির্দেশক বলে পরিচিত। প্রায় একশত বছর পর আমেরিকা এরকম আরেকজন মাত্র প্রেসিডেন্ট পেয়েছিল, যাকে বিশ্ববাসী আরো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি হচ্ছেন জন এফ কেনেডি। লিংকন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তিটি করে গেছেন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করে। গভর্নমেন্ট অব দি পিপল, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল—জনগণের জন্য, জনগণ পরিচালিত জনগণের সরকার। তবে তার ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর গ্যাটিসবার্গে প্রদত্ত ভাষণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা, একটি নতুন জাতিসত্তা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি বলেছিলেন, 'এ নিউ নেশন' একটি নতুন জাতির কথা যে জাতি সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে মুক্তির মূলমন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে, 'এ নিউ বাথ অব ফ্রিডমের' কথা। সেদিন তার এই আহ্বান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মুল ভিত্তি রচনায় সহায়ক।

স্যার উইনস্টন চার্চিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কট্টর সমর্থক ছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'ওভার মাই ডেড বডি, আমার লাশের ওপর ভারত স্বাধীনতা পাবে।

কিন্তু নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তার সেদিনকার নেতৃত্ব ছিল অনবদ্য ও অসামান্য। হিটলারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে। বলেছিলেন, 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করব'। বিবিসি থেকে ৪ জুন ১৯৪০ তিনি তার ভাষণে দেশবাসীকে দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন। 'উই শ্যাল ফাইট অন দি সিইজ, অ্যান্ড ওশেনস—জলে, স্থলে, সমুদ্রে সৈকতে আমরা যুদ্ধ করব। হোয়াটেভার মে বি দি কস্ট, যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করব, আমরা আত্মসমর্পণ করব না'।

কী অদ্ভুত মিল রয়েছে এই দুটি ভাষণের উদ্দেশ্য ও মূলবক্তব্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের। তবে রেসকোর্স ময়দানের ভাষণটি ছিল আমার মতে আরো অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী, অধিক গতিময়, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও ভাষার মাধুর্যে ও বাক্যবিন্যাসে অনেক মধুর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বল্প কথায় অনেক কিছু বলেছেন। আজকে সেই ভাষণের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ভাষণটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি চরণ নিয়ে একটি আলাদা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কেন এই ভাষণটিকে ঐতিহাসিক বলা হবে, এই উপমহাদেশের ইতিহাস কিভাবে পাল্টে দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান।

কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে ৭ মার্চের ভাষণ? স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রতিরোধের আহ্বান মুক্তির পথ নির্দেশনা? কারো কারো মতে ২৬ মার্চ নয়, সেদিন রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এর সপক্ষে প্রায়ই উদ্ধৃতি করা হয় সেই দুটি তাৎপর্যপূণ বাক্য 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই যে সংগ্রামের কথা বললেন তার মানে কি তাই আগে বিশ্লেষণ করা দরকার। সংগ্রাম বলতে আমরা বারবার বুঝে এসেছি অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই, আন্দোলন, সভা-শোভাযাত্রা, এমনকি হরতাল ও অসহযোগ। আবার সংগ্রামের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'যুদ্ধ' সংগ্রাম বলতে একসময়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কথা বোঝাতো। বঙ্গবন্ধু যে সংগ্রামের কথা বলেছেন, তা কি আন্দোলন, বিদ্রোহ, বিপ্লব, স্বাধীনতা ঘোষণা? সম্প্রতি কোনো কোনো মহল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে তার জবাবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স নয়, ডিক্লারেশন অব ওয়ার। রেসকোর্সের ভাষণ ছিল অস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের আহ্বান, সমগ্র বক্তব্য যদি

পুরোপরি একসঙ্গে পড়া হয়, তাহলে এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। সংগ্রামের ডাক দেওয়ার আগে তাঁর দুটি বক্তব্য অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' আর বলেছিলেন তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো। স্বভাবতই প্রশ্ন করা উচিত, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কেন? দ্বিতীয়ত কেন সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে বলা হয়েছে? এর মানে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হলো, এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শত্রু বলতে নিশ্চয়ই একটি প্রতিপক্ষের কথা বলা হয়েছিল, সেই প্রতিপক্ষ কোত্থেকে আসলো যদি যুদ্ধই না বাঁধে? সোজা কথায় তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন।

এ কারণেই আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে, ৭ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন, যে যুদ্ধ ছিল মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। ভাষণটির আরেকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে, অতীতের ভাষণগুলো থেকে এর উপস্থাপন ছিল ভিন্নতর। যাঁরা ভাষণটি শুনে থাকেন তারা নিশ্চয়ই মনোসংযোগ করে বুঝতে পারবেন, অতি ধীরে-সুস্থে বক্তব্য শুরু করে তিনি একসময়ে চরমে পৌঁছেছেন, ক্লাইমেক্সে গিয়ে বলেছেন, 'এই দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব'। তার আগে স্বল্পকথায় তিনি একটি ইতিহাস বিবৃত করেছেন, রাজনৈতিক পটভূমি দিয়েছেন। তারপর প্রস্তুতির কথা বলেছেন, সবশেষে একটি আহ্বান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছেন। মাঝে আছে পথনির্দেশনা, ভবিষ্যতের কর্মসূচি। 'যদি আমি হুকুম দেবার নাও পারি' তখন কী করতে হবে তা বলেছেন, অর্থাৎ সেনাপতি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা গ্রেপ্তার হন তাহলে কী করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। উইনস্টন চার্চিলের মাঠে, ঘাটে সমুদ্রতীরে যুদ্ধ করার মতো বলেছেন, 'ভাতে মারব, পানিতে মারব'। তাই তো ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার ডাক নয়, একটি যুদ্ধ ঘোষণা পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের নির্দেশনা। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তিনি সরাসরি বললেন না কেন যে সেদিন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন? বস্তুত এই প্রশ্নটি সেদিনই উঠেছিল, পরেও উঠেছে। ভাষণটি দেওয়ার আগেও অনেক আলোচনা বিতর্ক হয়েছে, রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু কী বললেন। ইয়াহিয়া সংসদ অধিবেশন বাতিল ঘোষণার পর যখন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানেই যা বলার বলব, তখনো সবাই এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছেন। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক, সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও ধরে নিয়েছিলেন, হয়তো এক যুগান্তকারী দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেওয়া হবে রেসকোর্স ময়দানে। পাঁচ লাখ নর-নারী সেদিন উল্লাস করে, শোভাযাত্রা করে, নেচে গেয়ে

ময়দানে হাজির হয়েছিলেন একটি মাত্র কথা শোনার জন্য, সে কথাটি ছিল, 'স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম'। এমনকি সভা শুরু হওয়ার পূর্বলগ্ন পর্যন্ত, বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করার পূর্ব-মহূর্তেও এ নিয়ে ছিল চাপা উত্তেজনা। তদুপরি তিনি সভাস্থলে আসতে দেরি করছিলেন, ৩২ নম্বরে বসে ছাত্র নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন, জঙ্গী নেতারা সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে, এসব খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধু এলেন, লাখ লাখ জনতার দিকে তাকালেন, তাদের মনের খবর কি তার অজানা ছিল? তাদের চাহিদা ও মনোবাসনা কি তিনি অনুধাবন করতে পারেননি? পেরেছিলেন, আবার এ খবরও তিনি রাখতেন তার সেদিনের বক্তব্য পাকিস্তানের ইতিহাস শুধু পাল্টে দেবে না। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কী বললে কী হবে, পাকিস্তানিরা সেই মুহূর্তে যা করবে তাও অনুমান করেছিলেন। শুধু সুদূরপ্রসারী নয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথাও তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। তারপর তিনি ধীরলয়ে ভাষণ শুরু করলেন, স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে তার ভাষণ এগিয়ে চললো, স্বরের উত্থান-পতন হতে লাগলো। সেদিন যারা পাঁচ লাখের সামিল ছিলেন তারা সেই নাটকীয় পরিস্থিতি স্মরণ করতে পারেন। তার বক্তব্য অতীত থেকে বর্তমানে এলো, তারপর ভবিষ্যতের দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা "এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব।"

সেদিন রেসকোর্স ময়দান থেকে যারা ফিরে গেল তাদের কারো কারো কাছে কি একটু হতাশাও ছিল না? ছিল বইকি! কারণ তারা একটি সুনির্দিষ্ট আওয়াজ, 'এখনি স্বাধীনতা, এই মুহূর্তে পূর্ণ মুক্তি চাই,' এ কথাগুলো শুনতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা দেওয়ার মালিক ছিলেন না এবং স্বাধীনতা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার নয়—এই দেওয়া নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রে লেনদেন যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত সুখকর হয়নি। তাছাড়া সাতই মার্চের আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন থেকে, যেদিন ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার সবুজ লাল সূর্যের মাঝে আঁকা মানচিত্র পতাকা উড়ছিল, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরকার চলছিল, অফিস আদালতে ও ব্যবসা কলকারখানায় কাজ চলছিল। সাতই মার্চের ভাষণে তাই বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন রক্তের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বলেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো'। এই রক্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মার্চের প্রথম থেকেই যে স্বাধীনতা কায়েম হয়েছিল তা স্থায়ী করার জন্য। দেশকে মুক্ত করতে নয়, আসলে মুক্ত রাখতেই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল পঁচিশে মার্চের কালো রাত থেকে। পঁচিশে

মার্চের রাতে আমাদের স্বাধীনতার ওপরই হামলা হয়েছিল। সাতই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধেরই আভাস দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাইতো সাতই মার্চের ভাষণ পড়তে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে আবেগ দিয়ে নয়, একাত্তরের ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও ব্যঞ্জনাকর উপলব্ধি করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রাজনৈতিক তাৎপর্য

ড. হারুন-অর-রশিদ

৭ মার্চ বাঙালি জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। আটত্রিশ বছর পূর্বে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জাতির উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখেন—ইতিহাসখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণ। তৎকালীন পাকিস্তানি জনগণই শুধু নয়, সারা বিশ্বের মানুষ ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে আছে, বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে কী বলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য এ ছিলো অন্তিম মুহূর্ত। অপরদিকে, স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য ছিলো পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা।

পেছনে ফিরে তাকানো যাক। বাঙালিদের ব্যাপক সমর্থন ও ভোট (১৯৪৬) না পেলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো কি-না সন্দেহ, সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ রাষ্ট্রে তাদের অবস্থা দাঁড়ালো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের। শুরু থেকেই পূর্ববাংলা পরিণত হলো পশ্চিম অংশের কলোনি বা বাজারে। গণতন্ত্রহীন অবস্থায় সামরিক-বেসামরিক আমলা নিয়ন্ত্রিত এ রাষ্ট্রের ওপর প্রতিষ্ঠা পেল পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। শোষণ-শাসনের পাশাপাশি বাঙালিদের ওপর চললো জাতি-নিপীড়ন। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রে তারাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বাঙালির মুক্তিসনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট অতি দ্রুত চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের মুখোমুখি নিয়ে এসে দাঁড় করায়। এমনি ফলাফলের জন্যে শাসকগোষ্ঠী আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। শুরু হলো প্রাসাদ (ক্যান্টনমেন্ট) ষড়যন্ত্র। এরই অংশ হিসেবে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য Constitutent

Assembly-র অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চের সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই দেশ পরিচালিত হতে থাকলো। তিনিই হয়ে উঠলেন de facto সরকার প্রধান। তাঁর ধানমন্ডি ৩২ সড়কের বাড়িটি পরিণত হলো ব্রিটেনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট (প্রধান মন্ত্রীর অফিস-কাম-বাসভবন)-এর অনুরূপ। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক Evening Standard পত্রিকার ভাষায় :

"Sheikh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East pakistan, with the complete support of the population... Rahman's home- in Dhanmandi, already known as Number 10 Downing Street in imitation of the British Prime Minister's residence- has been besieged by bureaucrats, politicians, bankers, industrialists and people from all walks of life" (12 March 1971, p. 10).

সারাদেশ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় বাহিনী নির্বিচারে গুলি ছুড়ে প্রতিদিন বহুজনকে হতাহত করে চলে। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে ওঠে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। সবাই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বড় ধরনের রাজনৈতিক ঘোষণার অপেক্ষায় অধীর। এমনি এক প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঘোষণা এলো। দেশ-বিদেশে সকলের ধারণা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ তার ভাষণে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। বিদেশি পত্র-পত্রিকায় এই মর্মে খবর ছাপা হয় (দ্রষ্টব্য : The Guardian, 5 March 1971, p. 12; The sunday Times, 7 March 1971, p. 1, 9; The Observer, 7 March 1971, p. 2; The Daily Telegraph, 6 March 1971. p. 1) দি ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক-এর ঢাকা থেকে পাঠানো একটি প্রতিবেদন— "E. Pakistan UDI (Unilateral Declaration of Independence) Expected" এ শিরোনামে পত্রিকাটির ৬ মার্চ সংখ্যায় ছাপা হয়। এতে ঢাকার বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির বিশদ বর্ণনা করে বলা হয়, Sheikh Mujibur Rahman is expected to declare independence tomorrow. দি সানডে টাইমস পত্রিকার ৭ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত করাচি থেকে পত্রিকার প্রতিনিধি পিটার হেজেল হার্স্ট প্রেরিত প্রতিবেদনে, East pakistan leader could declare UDI- এতে দুই ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা

হয় মুজিব একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন, নতুবা নিজেই Constitutennt Assembly-র অধিবেশন ডেকে উভয় অংশের প্রতিনিধিদের যোগদানের আহ্বান জানাতে পারেন।

শেখ মুজিব কর্তৃক একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণার সম্ভাবনা দেখে পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক চক্র নতুন কৌশল অবলম্বন করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ মার্চ রাতে দেশবাসীর উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে ইতঃপূর্বে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষিত Constitutennt Assembly-র সভা ২৫ মার্চ আহ্বানের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনে যে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণে তার সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠক। এর পেছনে পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক চক্রের উদ্দেশ্য ছিলো কালক্ষেপণ, যাতে পশ্চিম অংশ থেকে এ সুযোগে সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে এসে এখানে মোতায়েন করা যায়। ২৫ মার্চের সেনা-অভিযানই ছিলো তাদের মূল পরিকল্পনায়।

বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড এ বিষয়ে ওয়াকেবহাল ছিলেন না, এরূপ কেউ কেউ বলার চেষ্টা করে আসছে, যা বাস্তব ভিত্তিহীন। প্রকাশ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছিলো। কাজেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নীল-নকশা বুঝতে কোনোরূপ অনুমানের আশ্রয় নেওয়া দরকার হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে এটি দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণে মূল বক্তব্য কী হবে, তা স্থির করার লক্ষ্যে এর পূর্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি একটানা ৩৬ ঘণ্টা বৈঠকের পরও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় যা বলা আবশ্যক, তাই বলবেন বলে বঙ্গবন্ধু নিজের ওপর দায়িত্ব নিলেন (দ্রষ্টব্য "Speeches at Dhaka Race Course And Gettysburg", Mofizur Rahman in The Financial Express, 31 March 1995, p. 9). এরপর 'রাজনীতির কবি' (নিউজউইক ম্যাগাজিনের কথায়) সভামঞ্চে এসে উপস্থিত। বর্ণ-বৈষম্যবাদবিরোধী, আমেরিকার কালো মানুষের প্রিয় নেতা, বিশ্বনন্দিত মার্টিন লুথার কিং-এর মতো তার জনগণকে একটি স্বপ্নের কথা (I have a dream) বলতে নয়, তাদেরকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানাতে তিনি এলেন। মাত্র ১৮ মিনিটের এক ভাষণ রাখলেন। কী চমৎকার বক্তব্য! যেমনি সারগর্ভ, ওজস্বী ও যুক্তিযুক্ত, তেমনি তির্যক তীক্ষ্ণ ও দিক-নির্দেশনাপূর্ণ। অপূর্ব শব্দশৈলী,

বাক্যবিন্যাস ও উপস্থাপনা। একান্তই আপন, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন, 'আমাদের আর দাবায়ে (দাবিয়ে বা দাবাইয়া নয়) রাখতে পারবা না'। বঙ্গবন্ধু তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে—পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাঙালিদের অবস্থা ব্যাখ্যা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ তুলে ধরা, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা, সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ার ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে কোনো উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শ দান, ইত্যাদি কিছুর পর ঘোষণা করেন : " ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা"।

এ ছিলো একজন দক্ষ কৌসুলির সুনিপুণ বক্তব্য উপস্থাপনা। বিশেষ করে ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি স্বাধীনতার কথা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকলো না, অপরদিকে তার বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার অভিযোগ উত্থাপন করাও শাসকগোষ্ঠীর জন্যে আদৌ সহজ ছিলো না।

The Daily Telegraph পত্রিকার প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক ঢাকা থেকে প্রেরিত The end of the old pakistan শিরোনামযুক্ত এক প্রতিবেদনে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : "On sunday (৭ মার্চ) Sheikh Mujib came as near to declaring this (স্বাধীনতা) as he could without inviting immediate harsh reaction from the Army" (10 march 1971 p. 14)."

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিলো বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতারই ঘোষণা। একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বিশ্বে যাতে চিহ্নিত না হন, এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সদা সতর্ক ছিলেন। তাহলে, স্নায়ুযুদ্ধ চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। তাঁর সম্মুখে দৃষ্টান্ত ছিলো কিভাবে নাইজেরিয়ার বেয়াফ্রা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (১৯৬৭-১৯৭০) বৃহৎ শক্তি প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কঠোরহস্তে দমন করা হয়। তাই বঙ্গবন্ধু ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর অ্যাপরোচ হলো : মেজরিটি (বাঙালি) মাইনরিটি (পশ্চিম পাকিস্তানি) থেকে বিচ্ছিন্ন হবে কেন? বরং মাইনরিটিই 'সিসিড' করেছে বা আক্রমণকারী এটাই প্রতিভাত বা দৃষ্ট হোক (দ্রষ্টব্য The sunday Times, 7 March 1971, p. 9). নিউজউইক ম্যাগাজিনে এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা মিলে :

"A month ago, at a time when he was still publicly refraining from proclaiming independence, Mujib privately told Newsweek's Loren Jenkins that "there is no hope of salvaging the situation. The country as we know it is finished." But he waited for President Mohammed Yahya Khan to make the break. "We are the majority so we cannot secede. They, the Westerners, are the minority, and it is up to them to secede." (Poet of Politics, Newsweek, 5 April 1971).

বঙ্গবন্ধু অনুসৃত এই যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে সমর-কৌশলীদের বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, রাজনৈতিকভাবে দেখলে, ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্ব জনমতের সমর্থন এবং কূটনীতি উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংগ্রামের পক্ষে এর সুফল পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে অন্যতম। অনেকে এ ভাষণকে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ১৮৬৩ সালের বিখ্যাত গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। আব্রাহাম লিংকনের সে ভাষণও ছিল সংক্ষিপ্ত (মাত্র ৩ মিনিট) ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও উভয়ই ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। লিংকনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তি "This government of the people, by the people and for the people will never perish from the earth" বঙ্গবন্ধু বললেন : সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।

৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর অমর রচনা, বাঙালির মহাকাব্য। এ মহাকাব্য বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের ধারা ও স্বাধীনতার লালিত স্বপ্ন থেকে উৎসারিত। একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই এ মহাকাব্য রচনা সম্ভব ছিলো—কেননা, তিনিই হলেন এ ধারার সার্থক প্রতিনিধি।

কেন অবিস্মরণীয় সাতই মার্চ-এর অমর কাব্য

রণজিৎ বিশ্বাস

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের যে ক'টি উচ্চারণ কালজয়ী হয়েছে তার একটি হচ্ছে, "You may fool all the People some of the time, you can even fool some of the people all the time, but you can't fool all of the people all the time."

যুক্তরাষ্ট্র যখন গৃহযুদ্ধবিক্ষত তখন গ্যাটিসবার্গের অবিস্মরণীয় ভাষণের অতুলনীয় গদ্য কবিতায় লিংকন (দু'বার তিনি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন) অসামান্য একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—Government of the people for the people and by the people shall never perish.'

দেশের স্বাধীনতার মাসের প্রারম্ভ প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে আব্রাহাম লিংকনের 'গ্যাটিসবার্গ অ্যাডড্রেস'-এর কথা এবং কথার শুরুতে উদ্ধরণ-চিহ্নে বাঁধা তাঁর বাক্যটি মনে পড়ছে অকারণে নয়, একটা কার্যকারণ সম্পর্ক অবশ্যই আছে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভূগোলের উত্তর গোলার্ধের পূর্বপ্রান্তে কর্কটক্রান্তি ফুঁড়ে যাওয়া ঢাকার রেসকোর্সে তেমন একটি 'কাব্য' রচনা করেছিলেন আরেকজন কবি। দেশের মাপে 'ওজন' , গুরুত্ব ও সাময়িক প্রেক্ষিত বিবেচনায় এই ভাষণ গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতারই যেন প্রতিরূপ, তারই যেন ভাবার্থগত এক বঙ্গভাষিক রূপ এবং যুগসন্ধিক্ষণ বিবেচনায় তার মতোই ঐতিহাসিক।

এই ভাষণটি দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ একাধিক এক—এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি লিংকনের মতো, প্রথমবার অত্যন্ত জোরালো, ভয়ধরানো ও সাহসে উচ্চকিত ভাষায় পাকিস্তানিদের বলেছিলেন—অনেকদিন আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছো, আর সম্ভব হবে না। দুই—এই ভাষণেই দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝিয়ে

দিয়েছিলেন দখলদারিত্বের জবাব সাড়ে সাত কোটি বাঙালি কোন ভাষায় ও কোন কঠোরতায় দেবে। তিন—এই ভাষণে তিনি দেশবাসীকে দিয়েছিলেন আপৎকালীন দিকনির্দেশনা (আমি যদি হুকুম দিবার না পারি, তোমাদের ওপর আমার অনুরোধ রইল—ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল; যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে) এবং এই ভাষণেই তিনি দেশবাসীকে দিয়েছিলেন বরাভয় (রক্ত দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্) এবং চার—এই ভাষণেই তিনি কার্যত দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফেলেছিলেন। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—একটি দেশ যে স্বাধীনতার জন্য লড়বে এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে তারা যে 'অ্যাট অব দ্য পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' তা বোঝাবার জন্য এর চেয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

বাংলা ভাষায় আঁকা রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের সর্বসেরা কাব্যচিত্রে নির্মলেন্দু গুণ বাঙালির তন্দ্রীতে নাড়া দিয়ে, তাদের কলেজের বোঁটায় টান দিয়ে এবং তাদের বেদনার ও আনন্দের স্মৃতিকে উসকে দিয়ে যে কথাগুলো মুক্তোখণ্ডের মতো বসিয়েছেন, ৭ মার্চের বক্তৃতা যতোবার স্মৃত ও আলোচিত হবে, ততোবারই তার উদ্ধরণ চলতে পারে। রেসকোর্সে সেদিন সকাল থেকে সমাজের সর্বস্তরের (শ্রমিক, পেশাজীবী, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী) মানুষের মধ্যে কী বাগ্রব্যাকুল প্রতীক্ষা ছিল একটি অমর কবিতার পাঠ শোনার জন্য, কেমন করে তারা মাথায় গামছা অথবা লালপট্টি বেঁধে, কাঁধে লাঙ্গল ও হাতে কাস্তে নিয়ে দেশের একোণ সেকোণ থেকে ধেয়ে এসেছিল, তার বর্ণনা তিনি বড় নিখুঁত দিয়েছেন ওই বক্তৃতায়। একটি কবিতায় আরেকটি বড় কবিতার জন্মক্ষণ আঁকতে গিয়ে শেষ পঙক্তিতে তিনি অসামান্য ও অবিস্মরণীয় একটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। দৃপ্তপায়ে মঞ্চে উঠে 'অমর কবি' যখন শোনালেন—"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

জাতির জনকের বিশিষ্টতা এখানেই। তিনি দেশবাসীকে 'স্বাধীনতা' শব্দটির অর্থ মাহাত্ম্য সরল ও সর্ববোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণের স্বকীয়তা এখানেই যে সেই ভাষণ হয়েছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য 'স্বাধীনতা'র বাহন।

মাত্র সতের মিনিটের এই উপস্থিত-বক্তৃতায় তিনি সমকালীন সময়ের হেন বিষয় ছিল না, যা ছুঁয়ে যাননি। রাজনীতি থেকে সমরনীতি পর্যন্ত, অর্থনীতি থেকে আইন-শৃঙ্খলা পর্যন্ত, খাদ্য, ব্যবস্থাপনা থেকে সড়ক ও রেলযোগাযোগ পর্যন্ত, সীমান্ত প্রহরা থেকে বন্দর পরিচালনা টেলিযোগাযোগ থেকে শ্রমব্যবস্থাপনা পর্যন্ত এবং সরকারি প্রশাসন থেকে ব্যক্তিমালিকানা পর্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ এমন কোনো বিষয় ছিল না যা তিনি স্পর্শ করেননি। এখানেই অবাক হওয়ার পালা। কী এক দক্ষতায় তিনি অভাবনীয় ও অকল্পনীয়তায় এই বিশাল কম্মোটির এমন চারু ও শৈল্পিক সম্পাদনা করলেন, ভাবনে যাওয়া মানেই বিস্ময়ে ডুবতে থাকা ।

লক্ষণীয়, এই ভাষণে স্বৈরাচারী সরকার, দখলদার সৈনিক কিংবা তাদের হুকুম তামিলকারীদের উদ্দেশে কোনো অসংস্কৃত ও সৌজন্যরহিত শব্দ উচ্চারণ করেননি। অথচ, যেমন জোরালোভাবে তা উচ্চারণ করেছেন, তার বর্ণে বর্ণে যে বিশ্বাস ও প্রত্যয় এবং সংকল্প ও অঙ্গীকার ছিল, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি তাদেরও, যাদের সঙ্গে একত্র বসবাসের পাঠ আমরা কার্যত চুকিয়ে দিয়েছিলাম।

সাতই মার্চের ভাষণ যুগপৎ দু-তিনটি বিষয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। প্রথমত, এই ভাষণের বুলেট শব্দে ঘুমন্ত ও অর্ধজাগ্রত সবার চেতনার বোধন হয়েছিল, যারা জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিল অথবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেগে থাকার ভান করছিল, তাদেরও বুঝিয়ে দিয়েছিল—নয়নের আঁখি তোমাদের এবার সরাতে হবে, মণির ছানি কাটাতে হবে জন্ডিস জন্ডিস চোখ দুটোকে এবার সারাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এই ভাষণের পর দেশের মানুষ চূড়ান্তভাবে বুঝতে পেরেছিল। একদিন যাদের সঙ্গে থাকার জন্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহর পেছনে কিউ দেয়া হয়েছিল, গ্রীবার দু'পাশের রগ ফুলিয়ে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' রণধ্বনিতে বাতাস কাঁপিয়েছিল, তাদের সঙ্গে আর থাকা হচ্ছে না, তারা তাদের পাথরে ফুল ফোটাবার জন্য আমাদের হরিৎ নিসর্গকে উষর মরুর ধূসর প্রান্তরে পরিণত করার ষড়যন্ত্র এক বছর ধরে নয়, দু'বছর ধরে নয়, প্রায় আড়াই দশক ধরে করেছিল। তৃতীয়ত, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা 'শেখ মুজিব' নামের মানুষটি সম্পর্কে পাকিস্তানিদের মনে যে ভয় ছিল, এই ভাষণ তাকে বিশাল মহীরুহের আকৃতি দিয়েছিল। চতুর্থত, এই ভাষণের ফলে ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তানিরা উন্মত্ত সারমেয়র মতো বাঙালিদের মরণকামড় দেয়া শুরু করে এবং নিজেদের মরণ ও চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনার পথে এগিয়ে যায়। পঞ্চমত, এই ভাষণই অত্যন্ত

কার্যকরভাবে আমাদের বোধিতে পরিষ্কার করে দেয় যে, স্বাধীনতা কেউ কাউকে উপহার দেয় না, তা রক্তের দামে অর্জে নিতে হয়।

এই ভাষণ সম্পর্কে সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ মূল্যায়ন হিসেবে একটি বাক্য উচ্চারণের জন্য মন সদাসর্বদা কদম বাড়িয়ে থাকে। এর গায়ে বিস্মৃতির ধুলো কোনোদিন কোনো অস্বচ্ছ আস্তরণ তৈরি করতে পারবে না। যে ভাষণের প্রণোদনায় মানুষ স্বাধীনতার অর্থ নতুন করে বোঝে, স্বাধীনতার জন্য মানুষ বহ্নিমুখ পতঙ্গ হয়ে যায় এবং যে বাণী ও মন্ত্রের জোরে মানুষ একাট্টা হয়ে কুসংস্কার, একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রকে অবজ্ঞায় ছুড়ে ফেলতে পারে, তা কোনোদিন ধুলোমলিন হতে পারে না। ইতিহস বিকৃতির কোনো ষড়যন্ত্রেও না।

শেখ সাহেব ও ৭ মার্চের ভাষণ
নির্মল সেন

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ বেতার-টেলিভিশনে প্রচারের দাবি জানানো হয়েছে। আমি বুঝতে অক্ষম, এতোদিন শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ভাষণ বেতার, টেলিভিশনে বাজানো হয়নি কেন? বাংলাদেশ তো একদিন টুপ করে আকাশ থেকে পড়েনি। এর পেছনে অসংখ্য সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের প্রথম নাম শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাকে মুছে ফেলা যায়নি। প্রকাশ্যে বা গোপনে হোক মানুষ তার ভাষণ বাজিয়েছে। তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তার নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু সফল হয়নি। আজকে স্পষ্ট বলা দরকার ১৫ আগস্টের পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা আদৌ বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। তাই তারা প্রথমে হত্যা করেছিল বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরে একে একে বাংলাদেশের সমস্ত ঐতিহ্য শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা প্রথমে হস্তক্ষেপ করেছে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চারনীতিতে। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। তারা কলমের খোঁচায় ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রকে করেছে সামাজিক ন্যায়বিচার। মনে হয়, তারা মার্কস এবং এঙ্গেলসের উত্তরাধিকারী। দেখা যাবে বাংলাদেশের সংশোধিত সংবিধানের ভিন্ন রূপ। সংবিধান সংশোধন করে জিয়াউর রহমান যে সংযোজন করেছিলেন, তার ভূমিকায় প্রথমে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন ও অন্যান্য সংসদ সদস্যের নাম আছে। পড়লে মনে হবে, সংবিধান সংশোধন করেছিলেন শেখ সাহেব ও তৎকালীন আওয়ামী লীগের সদস্যরা। কিন্তু এ করেও কি শেখ সাহেবকে মুছে ফেলা গেছে? আমি তো ৭ মার্চের ভাষণ সামনের বেঞ্চে বসে শুনেছিলাম। সে ভাষণে সবকিছু ছিল। যারা বলেন শেখ সাহেব দেশকে অপ্রস্তুত রেখে সংগ্রামের

ডাক দিয়েছিলেন, তারা কি লক্ষ্য করেননি শেখ সাহেব ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। ... শেখ সাহেবের এ ভাষণের পরও কি বিশ্বাস করতে হবে তিনি সংগ্রামের ঘোষণা দেননি ৭ মার্চ? তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করতে যে সেকালে কত বড় বুকের পাটা দরকার, তা কি কেউ অনুভব করতে পারবেন? একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের কথা কেউ কোনোদিন শুনেছেন? আমি তৎকালীন বামপন্থী নেতাদের বলতে শুনেছি, শেখ বুর্জোয়াদের নেতা। তাই তিনি ৭ মার্চ স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। কিন্তু আমার বাম বন্ধুরা কি খেয়াল করেছেন, শেখ সাহেবের পক্ষে ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না? তবে যারা তাঁর ঘোষণার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা আপনাআপনিই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা যুদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। আজকে একদল লোক বলে, স্বাধীনতার ঘোষক শেখ মুজিবুর রহমান নন—ঘোষক হচ্ছেন মেজর জিয়াউর রহমান। এ নিয়ে বাংলাদেশে প্রবল বির্তক চলছে। জিয়াউর রহমানপন্থীদের বলতে চাই যে, ২৭ মার্চের সাহসী ঘোষণার জন্য আমি জিয়াউর রহমানকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে ঘোষণা জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন তার ভিত কে রচনা করেছিল? শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ভাষণ কি জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ভাষণ থেকে পৃথক করে দেখা যায়? তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধ থাকে? আমি সারা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘুরেছি। প্রতিটি শিবিরে গিয়েছি। সেখানে দুটি শব্দ শুনেছি, একটি শেখ মুজিবুর রহমান আর একটি জয় বাংলা। আমি জয় বাংলা বলে হাজার হাজার তরুণকে ছুটতে দেখেছি। আমি শরণার্থী শিবিরে গিয়েছি। সেখানে প্রতিটি ঘরে একটি নামই শুনেছি, সে নামটি হলো শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানের নাম নিয়ে অসংখ্য তরুণ মৃত্যুবরণ করেছে। মৃত্যুর পূর্বে বলে গেছে, তার সমাধি যেন স্বাধীন বাংলায় হয়। এই ইতিহাস পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে। আমরা লক্ষ করলাম, তিনি শুধু সংবিধান সংশোধনই করলেন না, তার আমলে জয় বাংলা শব্দ যেন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। পাকিস্তানি হানাদারদের মতো টেলিভিশন ও বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বাঙালির মন

থেকে শেখ সাহেবের নাম কি মুছে ফেলা গেল? আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা বুকে হাত দিয়ে বলুন, বাংলাদেশ থেকে শেখ সাহেবের নাম কি মুছে ফেলা যাবে? শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে? আজকে সেনাবাহিনীর যে সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য বহন করেন, তারা কি বাংলাদেশ ও তার সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে মনে করেন না ? আজকে প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আপনি তো সব ইতিহাসের খবর রাখেন। আপনি কি ৭ মার্চের ভাষণ ছাড়া বাংলাদেশ কল্পনা করতে পারবেন? শেখ সাহেব বাংলাদেশের হাটে-মাঠে-ঘাটে এবং মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। এ সত্যকে আপনি অস্বীকার করবেন কী করে? আমি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে শেখ সাহেব কি একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি? আজকে আপনার কি একটু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই? ওই মহান নেতার মৃত্যু দিবসে আপনি জন্ম দিবস পালন করেন। আমি বিশ্বাস করি রাজনৈতিক কারণে অনেক কিছু করতে হয়। অনেক কৌশল নিতে হয়। কিন্তু যে কৌশল আদর্শগতভাবে মানুষকে নিঃস্ব করে দেয় যে কৌশল মানুষকে নীতি বিবর্জিত করে, সে কৌশল আপনি নেবেন কেন?

এবার রাজনীতির হৈচৈ নেই। আপনারা সবাই নীরবে বসে চিন্তা করুন। ওই লোকটির প্রতি কী অন্যায় আপনারা করেছেন? তাঁর হত্যার বিচার পর্যন্ত আপনারা সঠিকভাবে হতে দেননি। একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির হত্যার বিচার হয়নি। এ লজ্জা, এ দুঃখ রাখব কোথায়? তাই আমার আবেদন, ওই মানুষটিকে এবার আসুন সবাই শ্রদ্ধা জানাই। তার ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করি। আমি বিশ্বাস করি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যদের শেখ সাহেবের ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকবে না। কারণ শেখ সাহেবের নাম না থাকলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকে না। আর আপনাদের অস্তিত্বও ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা হয়ে যায়। তাই আমি আবেদন জানাব, এবার যেন শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ভাষণ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। আমি রাজনীতি করি। কিন্তু আওয়ামী লীগ করি না। আওয়ামী লীগের বিপরীতে আমার অবস্থান। তবুও আমি শেখ সাহেব ও ৭ মার্চকে অস্বীকার করতে পারি না।

জনকণ্ঠ- ৭ মার্চ-২০০৭।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র

ড. এম সাইদুর রহমান খান

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—বঙ্গবন্ধুর এই অমিত বাণী হৃদয়ে ধারণ করেই লাখ লাখ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ দিয়েছে অগণিত মুক্তি সংগ্রামী ।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অধীনে ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদের যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সব হিসাবনিকাশ ওলট-পালট হয়ে যায়। নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বাংলার জনগণ ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছে, কাজেই এর ভিত্তিতেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি সামরিক সরকারের নানা ষড়যন্ত্র। এরই অংশ হিসেবে দেখা গেল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্বনির্ধারিত ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১ মার্চ আকস্মিকভাবে বেতার-টিভিতে ভাষণের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। আগুনের লেলিহান শিখার মতো প্রতিবাদে ফেটে পড়ল বাংলার জনগণ। অফিস-আদালত, দোকানপাট বন্ধ হলো। স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা বন্ধ রেখে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ছাত্রসভাতে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়। গোটা বাঙালি জাতি সেদিন বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বজ্রকঠিন শপথে ছিল ঐক্যবদ্ধ। ৬ দফা মানতে হবে, 'জয়বাংলা' স্লোগানে ঢাকাসহ সারাদেশ ছিল মুখরিত। বঙ্গবন্ধু সেদিন (১ মার্চ) হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ

পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বললেন, 'আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তির জন্য চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচকরা (যাদের অধিকাংশই স্বাধীনতাবিরোধী বা উগ্র বামপন্থী) প্রায়ই বলে থাকেন কেন তিনি ৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তাদের মতে, ওইদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলে নাকি অতি সহজেই দেশ স্বাধীন হতো এবং ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হতো। প্রশ্ন হলো, আসলেই কি ব্যাপারটি অত সহজ ছিল? পরিবেশ পরিস্থিতি কি ওই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করার অনুকূলে ছিল? এসব প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে তখনকার বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ দরকার। ষাটের দশকে এশীয় রাজনীতিতে পাকিস্তান ছিল আমেরিকার প্রধান মিত্র। চীনের সঙ্গেও পাকিস্তানের ছিল মধুর সম্পর্ক। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ছিল বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্ধ সমর্থক। এমন এক পরিবেশে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়েছিল। তার পিছনে যে হতদরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তারাও কিছুদিন আগ পর্যন্ত প্যান ইসলামিক আবেগে তাড়িত হয়ে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। শহরাঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছাত্র-জনতার কণ্ঠে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগান উঠেছে ঠিকই, তবে সে স্লোগান সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে কতটুকু আসন করতে পেরেছে তার পরীক্ষা তখনও হয়নি। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনে তারা ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দিয়েছে, স্বাধীনতার পক্ষে নয়। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তার প্রতিক্রিয়া দেশে ও বিদেশে কিরূপ মারাত্মক হতে পারে বিচক্ষণ মুজিব তা ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আলোচনার টেবিল ছেড়ে এসে রাজপথে এরূপ ঘোষণা দিলে তিনি বিশ্ব দরবারে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসাবে চিহ্নিত হতেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম পৃথিবীর কোনো জাতিই সমর্থন করে না। মুজিবকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে বাঙালিদের

ওপর গণহত্যা চালানো বিশ্ববাসীর কাছে বৈধ বলে গণ্য হতো। এরূপ অবস্থায় পাকিস্তানের বন্ধুরা পাকিস্তান রক্ষার অজুহাতে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেতো। সপ্তম নৌবহর তখন আর হয়তো বঙ্গোপসাগর থেকে ফিরে যেতো না।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সেই উত্তাল দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ডাকে মাথা তুলে দাঁড়াল পূর্ববাংলা, বিশ্ববাসী দেখল এক অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলন। এই সময়টা ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে যেমন সবচেয়ে গৌরবের, তেমনি আবার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময়ও বটে। অনেক বিকল্পের মধ্য থেকে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। সে সিদ্ধন্তে এতোটুকু ভুল হলে জাতিকে দিতে হতো চরম মূল্য। বাঙালি জাতির সৌভাগ্য এমন এক বিচক্ষণ দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন তার কাণ্ডারি।

৭ মার্চের ভাষণকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর ওপর নানা মহলের চাপ আসতে থাকে। ৬ মার্চের রাত ছিল তার জীবনে এক মারাত্মক সমস্যাপূর্ণ রাত। তাঁর তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল হলে তা হবে দেশের জন্য ভয়াবহ। পরদিন ৭ মার্চ সকালে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ওই বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পরিষ্কার ভাষায় ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের কথা বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেন। পূর্ববাংলায় স্বঘোষিত স্বাধীনতা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করবে না। এরপর বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। সে বৈঠক শেষে ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) থেকে আগত উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আ স ম রব প্রমুখ। তাঁদের দাবি—পূর্ববাংলার স্বঘোষিত স্বাধীনতা। অন্যদিকে দলের প্রবীণ ও দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে। এহেন বিভিন্নমুখী চাপের মুখে এক উত্তপ্ত পরিবেশে স্বাধিকার আন্দোলন যখন একেবারে চরম পর্যায়ে এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রায় পুরোটাই উগ্র জাতীয়তাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে তখন বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে কী ভাষণ দেন তা জানার জন্য সবাই উদগ্রীব। অবশেষে তিনি মাত্র ১৭ মিনিটের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে সকল মহলকেই সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তানের

সামরিক চক্র চেয়েছিল শেখ মুজিব একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিক। তাহলে তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং একটি স্বীকৃত সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার নায়ক হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত করা সহজ হতো। দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ মুজিব সামরিক জান্তার সেই ফাঁদে পা দেননি। তিনি বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পথ অনুসরণ করেননি। একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অসময়ে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তার ফল হবে একটা বিরাট শূন্য। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্লাকশিপ হিসেবে চিহ্নিত হবেন, স্বাধীনতা নামক সোনার হরিণটি চিরদিনই অধরা থেকে যাবে বায়াফ্রার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ওজুকো এমেকার মতো। তেলসমৃদ্ধ বায়াফ্রা এখনও নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশ হিসেবেই টিকে আছে, বাধ্য হয়ে বায়াফ্রাবাসী তা মেনে নিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদিমূলে অসংখ্য বায়াফ্রান তরুণ সেদিন তাদের বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করলেও নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে সেই রক্তদান বৃথা যায়। পাঞ্জাবের শিখ নেতা ভিন্দ্রানেওয়ালরে খালিস্তান আন্দোলন কিংবা প্রভাকরনের এলটিটি আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। শেখ মুজিব তার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বলে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন হঠকারী সিদ্ধান্ত অনেক সময় সস্তা জনপ্রিয়তা এনে দিলেও বাংলার স্বাধীনতা অর্জনকে তা দূরে ঠেলে দেবে। তাই তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হিসাবনিকাশ করে কৌশলের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যান। শেখ মুজিব সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আক্রমণোদ্যত পাকবাহিনীর হাতে গণহত্যার একটি শক্তিশালী অজুহাত তুলে দেয়া হতো এবং হাজার হাজার নর-নারীর রক্তে ভেসে যেতে পারতো রেসকোর্স ময়দান।

(উল্লেখ্য, শেখ মুজিব যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন রেসকোর্স ময়দানের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার চক্কর মারছিল)। রাষ্ট্রদ্রোহী জনগণের ওপর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ তখন বহির্বিশ্বে বৈধতা পেতো। সব দোষ তখন মুজিবের ওপর চাপানো হতো। বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক মুজিব এ ধরনের সম্ভাব্য মারাত্মক পরিস্থিতি সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। তাই তিনি সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' যা ছিল প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতার ঘোষণা। কারণ তার ভাষণে তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল,

তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে' এটা তো ছিল কৌশলগতভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার উদাত্ত আহ্বান। আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ না করে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা এড়িয়ে তিনি কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করেন। শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই তিনি সুকৌশলে ওই ভাষণে বাংলার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। তিনি এটাও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তাকে হয়তো ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দি করে রাখা হবে কিংবা হত্যা করা হবে। তাই তিনি তার প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা সব রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেবে। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। শত্রুর বিরুদ্ধে এমন হুশিয়ারি কেবলমাত্র মুজিবের মতো অবিসংবাদিত নেতার পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি তার ভাষণে জনগণকে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন এবং আপনাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরও রক্ত দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'। এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, অন্যদিকে এর সফলতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কেবলমাত্র আত্মবিশ্বাসী এক রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই এ ধরনের উক্তি করা সম্ভব। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—বঙ্গবন্ধুর এই অমিত বাণী হৃদয়ে ধারণ করেই লাখ লাখ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ দিয়েছে অগণিত মুক্তি সংগ্রামী। ওই ৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ—যা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে যে বাঙালি জাতিকে তিনি ধাপে ধাপে প্রস্তুত করেছিলেন স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে, এই ভাষণের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত পরিণতির আহ্বান জানালেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এ ভাষণ ছিল আমাদের যুদ্ধ স্লোগান। তার এই বক্তৃতা সাড়ে

সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত এই ভাষণই ছিল কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে প্রোৎসাহিত করেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। অনেকের মতে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ ভাষণের চেয়েও আবেগময়। ভাষণটি ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বর সংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। এই বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফলশ্রুতি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ : তার প্রেক্ষাপট ও শিখর চূড়া

শামসুজ্জামান খান

বাঙালি জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ধারাবাহিক করুণ ইতিহাস আছে তা বর্ণনা করার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া আছে আবেগ, রক্ত ঝরানোর নির্মম স্মৃতি এবং তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আশা প্রত্যাশার ন্যায্যতা, আছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ন্যায্যতা, আছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং যুক্তির জোরালো উপস্থিতি। এই সব মিলে এই ভাষণ এক জগতশ্রেষ্ঠ ভাষণ।

সাত মার্চ। বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। শুধু 'ঐতিহাসিক দিন' বললে এই দিনের বৈশিষ্ট্য এই দিনের অগ্নিগর্ভ নানা উপাদান, এই দিনে বাঙালির আবেগ-উত্তেজনা-উদ্বেগ-শঙ্কা, এই দিনের আশা-প্রত্যাশা নতুন দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনা আর কোনো ঐতিহাসিক দিনের মতোই নয়—সে জন্যই এই দিনের সঙ্গে অন্যকোনো দিনের তুলনা চলে না। তবে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সঙ্গে এই দিনের একটা মিল আছে। ৭ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির সার্বিক ঐক্যের সাজুয্য আছে। তবে ৭ মার্চে যে শঙ্কা ও উদ্বেগ ছিল ১ ডিসেম্বর সেখানে ছিল আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে স্বজন হারানোর বেদনা—দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তানি দখলদার ও জামায়াতী স্বাধীনতাবিরোধী ফ্যাসিস্টদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যার অচিন্তনীয় ও হতবাক করে দেয়া ঘটনার উদ্ঘাটন।

পূর্ববাংলার বাঙালিরা শত সহস্র বছর ধরে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে বাংলার অন্য অংশের বাঙালিদের সঙ্গে কিন্তু বাঙালি জাতির স্বাধীনতার পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই ফাইনেস্ট আওয়ার বা সুন্দরতম সময়কে সম্ভব করে তুলেছে 'বাঙাল' বঙ্গের একসময়ে উপেক্ষিত, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল তারাই স্বাধীনতাকামী উন্মুল বাঙালদের 'জয় বাংলা'র মানুষ হিসেবে আপন করে নিয়ে নিজ ঘরে খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করে তুলতে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছে। ইতিহাসের এ এক মধুর ক্ষতিপূরণ।

এক.

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ একদিন বা আকস্মিকভাবে আসেনি। তিলে তিলে, বছরের পর বছরের স্বপ্ন, সাধনা, সংগ্রাম, ত্যাগ ও ছোট ছোট সাফল্যের মধ্যে দিয়ে এই দিনকে সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—পূর্ববাংলার শোষিত বঞ্চিত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তাদের এবং তার নিজের জীবনের বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষা-জেলজুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনের ভেতর দিয়ে যেয়ে। বহু আগে থেকে স্থির লক্ষ্যে দ্বিধাহীন চিত্তে অনড় মনোভাব নিয়ে এগুতে না পারলে এমন বারুদঠাসা একটা দিন সৃষ্টি করা যায় না। জাম্প করে বা উল্লম্ফনের মাধ্যমে এমন একটা দিনকে সম্ভব করা অসম্ভব। বঙ্গবন্ধু এ সম্পর্কে বলেন : আমি জাম্প করার মানুষ নই। আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি ইমপ্যাসেন্ট হই না। আমি অ্যাডভাঞ্চারিস্ট নই (বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ১৯৭৫)। বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা-অন্বেষার ধাপসমূহ তিনি নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন আমাদের। তার বক্তব্য : "১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হলো। সেই দিন বুঝতে বাকি রইল না যে, বাংলাদেশকে উপনিবেশ করার জন্য, বাংলার মানুষকে শোষণ করে গোলামে পরিণত করার জন্য তথাকথিত স্বাধীনতা এসেছে। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৪৭ সালে কলকাতার পার্ক রোডের সিরাজউদদৌলা হোস্টেলে একটা ঘরোয়া বৈঠক করি। ... কলকাতা থেকে বিএ পাস করে ঢাকায় এলাম। ঢাকায় এসে রাজনৈতিক পরিবেশ দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে, বাঙালি জাতি শেষ হয়ে গেছে। সেই দিন শপথ নিলাম, বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে। ১৯৪৭ সালেই হলো আমাদের সংগ্রামের সূচনা (বঙ্গবন্ধুর ভাষণ : কামরুজ্জামান লিটন সম্পাদিত সঙ্কলন)।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে তাঁর লড়াকু ভূমিকা তার স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অংশ। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই 'বাঙালি জাতি শেষ হয়ে গেছে—পর্যায়কে পেছনে ফেলে বাঙালি জাতির নবউত্থানের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪৮-এর এই প্রথম ভাষা আন্দোলনে তখনকার তরুণ নেতা শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তিনি জেলে থাকলেও এ আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জেল থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কেবিনে আনা হলে গভীর রাতে আন্দোলনকারী ছাত্র নেতাদের নিয়ে মিটিং করে আন্দোলনের পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া তার মুক্তির দাবিতে

তিনি জেলে অনশন শুরু করার ঘোষণা দিলে তাকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেই জেলে তিনি ও মহিউদ্দিন আহমদ ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ দিনব্যাপী অনশনের পর মুক্তিলাভ করেন। অতএব ১৯৪৮ ও '৫২ দুই ভাষা আন্দোলনেই তিনি মুক্ত অবস্থায় এবং জেলের ভেতরে লড়াকু ও মরণপণ লড়াই করেন। শেখ মুজিবের পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকের আন্দোলনের তাৎপর্য ভূমিকা সম্পর্কে লন্ডনের অবজার্ভার পত্রিকা বলেছে : ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশের নেপথ্যে শেখ মুজিবই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। এর তিন বছর পরে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির পেছনেও শেখ মুজিবই ছিলেন প্রধান চালিকাশক্তি (লন্ডন ২৮ মার্চ, ১৯৭১)।

এভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা চিন্তার একটা ধারাবাহিক ও সুস্পষ্ট চিন্তা ও তদানুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : এক. ১৯৪৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ গঠন, একই বছরে প্রথম ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, ১৯৫২-৫৩ সালে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা, '৫৫ সালে বাঙালি জাতির নিজস্ব গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বর্জন। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই লক্ষ্যে পাকিস্তান গণপরিষদে সংসদীয় সংগ্রাম : যথা ক. বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রশ্নে :

"It is a very serious matter for us and here nobody can force us not to speak in our own mother tongue. I will her and now, speak in Bengali and nobody can prevent me from doing that"(২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)

খ. We would like to be called ourselves as Bengali (২১-৯-৫৫)

গ. Do not Play with fire, Give us autonomy with three powers in the centre.

ঘ. I know this that the ruling clique, the ruling junta is as just like a knife while the people of East Pakistan are considered to be fish (২১-৯-৫৫)

ঙ. Zulum mat karo bhat, if you do not allow the people to

follow constitutional means, they will perforce unconstitutional means.

চ. Democratic Provisons to be inserted otherwise a time is coming when you will realise the Consequences of this wrong action (২২.৯.৫৫)।

নির্বাচন ও গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক শাসক আয়ুবের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করে (১৯৫৮) পূর্ব-বাংলার জনগণকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ১৯৬০-এর দশক থেকেই বঙ্গবন্ধু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করেন। ১৯৬১ সালে জনগণের মধ্যে 'ফিলার' হিসাবে তার নির্দেশে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে 'স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান' শীষক একটি লিফলেট ছাড়া হয়। সামরিক শাসনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ঢাকা ও ফজলুল হক হলে এই লিফলেট বিলি করা হয়। তখন সামরিক শাসন-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মার্কটাইম শুরু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এভাবেই ছাত্রলীগের মাধ্যমে তার স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধ্যানধারণা, চিন্তা ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চিন্তাধারা বাজারে ছেড়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতেন। এর পর পরই ছাত্রলীগকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের কমন রুমে অনুষ্ঠিত সভায় অনেকটা সঙ্গোপনে শাহ মুয়াজ্জেমকে সভাপতি ও শেখ ফজলুল হক মনিকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় (বর্তমান কলাম লেখকও সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিছুটা সংশ্লিষ্ট ছিলেন—এর পর পরই তিনি ঢাকা হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন)। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মপরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ছাত্র নেতাদের নিয়ে স্বাধীনতার 'নিউক্লিয়াস' গঠন করে দেন। এই নিউক্লিয়াসের সদস্য ছিলেন সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক ও শেখ ফজলুল হক মনি। এই নিউক্লিয়াস 'স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস' হিসেবে পরিচিত ছিল। এই কিউক্লিয়াসের প্রথম কাজ ছিল কিছু উপযোগী ও জনগণকে আকৃষ্ট করে এ ধরনের স্লোগানের উদ্ভাবন। বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রথম দুটি স্লোগান ছিল জাগ, জাগ বাঙালি জাগ, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। এ দুটি স্লোগান ১৯৬২ সালে চালু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে আসে 'ঢাকা না পিন্ডি-ঢাকা ঢাকা' এবং তারপরই বিস্ফোরক স্লোগান 'জয়বাংলা'। এই স্লোগান বাঙালি জাতিকে এমন ঐক্যবদ্ধ করে যার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ১৯৭৫ পরবর্তী কালে পাকিস্তানি চেতনায় আচ্ছন্ন জিয়া

'বাংলাদেশী' ও 'জিন্দাবাদ' স্লোগান সামনে এনে বাঙালির ঐক্যকে ভেঙ্গে দেন এবং বাংলাদেশের গোটা বাঙালি জাতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেন। সেই বিভাজনই বাংলাদেশের বাঙালিকে দুর্দশাগ্রস্ত এবং তার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে।

দুই

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি শত শত বছর ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে, অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে এবং তার ফলে স্বাধীনতার যে প্রত্যাশাটি উন্মুখ হয়ে উঠেছে তাকে ভাষা দিয়েছেন এবং এই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা এবং এই সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা।

কী নেই উনিশ মিনিটের এই মাস্টারপিস তুল্য ভাষণে? বাঙালি জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ধারাবাহিক করুণ ইতিহাস আছে তা বর্ণনা করার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া আছে আবেগ, রক্ত ঝরানোর নির্মম স্মৃতি এবং তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আশা প্রত্যাশার ন্যায্যতা, আছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ এবং যুক্তির জোরালো উপস্থিতি। এই সব মিলে এই ভাষণ এক জগতশ্রেষ্ঠ ভাষণ। বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতাই এ ভাষণের মূলকথা। বাঙালি যে এক লড়াকু জাতি, স্বাধীনতার জনা জীবনদান তার কাছে এক তুচ্ছ ঘটনা আর তাই, 'বঙ্গবন্ধু বলেন আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।' সাহিত্যের তোরাপ, হানিফ, পুরাণের চাঁদ সওদাগর আর রাজনীতির শেখ মুজিবের মুখেই এমন উক্তি মানায়। এরপরই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে তিনি মূল কথাটি বলেন—'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ উচ্চারণ।

আর এই উচ্চারণকে সফল করার জন্য তিনি গেরিলা যুদ্ধের রূপরেখা নির্দেশ করেছিলেন, "তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।"

স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল সাতই মার্চের রেসকোর্স ময়দান

হারুন চৌধুরী

১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক সাতই মার্চ ছিল রবিবার। ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা বাংলাদেশে এর প্রতিবাদে হরতালের ডাক দেন। সমস্ত বাঙালি জাতি মুসলিম লীগের সমর্থন বাদে সবাই বঙ্গবন্ধুর হরতালকে সমর্থন করে।

৩ মার্চ বুধবার হরতাল হলো। রাস্তাঘাটে মিছিল হলো। বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পাকসেনারা নির্বিচারে ঢাকার রাস্তায় গুলি চালাল। আবারও ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হলো। গুলি হলো ঢাকায়, গুলি হলো চট্টগ্রামে, গুলি হলো খুলনায়, গুলি হলো রাজশাহীতে, রংপুরে, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ আরো অনেক জেলায়। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিলেন।

আন্দোলনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামগঞ্জে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের কথা ভেবে দাবি করলেন অবিলম্বে সকল সৈন্য ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। ১ মার্চ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত পাকসেনারা অনেক রক্ত ঝরিয়ে বিকেলে ব্যারাকে ফিরে গেল। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন তাঁর ৮ দফা দাবি। তিনি ঘোষণা করলেন ইয়াহিয়া খান যদি তার দাবি না মানে তাহলে তিনি অ্যাসেম্বলিতে যাবেন না। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৮ দফায় ছিল : এক. সামরিক আইন বাতিল করতে হবে। দুই. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। তিন. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। চার. সমস্ত হত্যার তদন্ত করতে হবে। পাঁচ. ভবিষ্যতে গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে। ছয়. পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি বন্ধ করতে হবে। সাত. আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পূর্ববাংলার পুলিশ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস

বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আট. পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চে যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিল তার সব আয়োজন নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল। অধিবেশন উদ্বোধন করবেন সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানের চিফ ইলেকশন কমিশনার আব্দুস সাত্তারকে। স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের তখনকার সহসভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঢাকায় আসা আরম্ভ করেছেন। পিপলস পার্টির কিছু কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধিও ঢাকায় এসেছেন। ইয়াহিয়া খান শর্ত দিয়েছিল একাত্তর সালের ৩০ জুনের মধ্যে নতুন সংবিধান রচনার কাজ শেষ করতে হবে। তিনি সামরিক ছত্রছায়ার গঠিত মন্ত্রিসভা বাতিল করবেন, তবে তিনি নিজে প্রেসিডেন্ট থাকবেন। একমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া সব দলই ঢাকার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে রাজি হলেন। ভুট্টোর পরামর্শেই ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের সব আয়োজন বাতিল করলেন। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্র জনতার জয় বাংলা ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। অপরদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নুরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আ স ম আব্দুর রব ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে ছাত্ররা অস্ত্র হাতে নিয়ে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেহনতি জনতার মুখে স্লোগান উঠল- "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।"

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিলেন, ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিনি ভাষণ দেবেন। সে দিন সবাই জেনে গিয়েছিল যে, তিনি বাঙালি জাতিকে একটা চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা দিতে যাচ্ছেন। সবার মনেই তখন আতঙ্ক, বঙ্গবন্ধুর রায় ঘোষণার অপেক্ষায় সবাই। ৬ মার্চ জানা গেল পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসানকে অপসারণ করে বালুচ সেনা পরবর্তীকালে বুচার অব বেঙ্গল নামে পরিচিত টিক্কা খান ঢাকার গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করবে। মিছিলে মিছিলে ঢাকা শহর তখন মুখরিত। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে মানুষের ভিড় লেগেই আছে। ৬ মার্চ রাতে অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান পুকু ভাইয়ের ধানমন্ডির সাত নম্বর রোডের বাসায় রাত্রিযাপন করব বলে গিয়েছি। হাবিব ভাই ১৯৫৪ সালে বৃহত্তর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজে তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে এমএ এলএলবি পাস করে ঢাকা বারে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেছেন। আয়ুবী আমল ও ইয়াহিয়ার মার্শাল ল'র যুগে যখন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের

পুলিশ হয়রানি করে জেলে পুরেছে তখন অন্যকোনো আইনজীবী তাদের জামিনের জন্য খুঁজে না পাওয়া গেলে এই অ্যাডভোকেট হাবিব ভাই নিজের পকেটের টাকা খরচ করে তাদের জামিন করেছেন। এ কথা স্বয়ং ভাষাসৈনিক অ্যাডভোকেট গাজীউল হকের মুখ থেকে শোনা। হাবিব ভাইয়ের বাসায় রাত্রিযাপন করার পর সকালেই ছুটলাম ইকবাল হলের দিকে। দুপুরে মিছিলের স্রোত বয়ে চলেছে রেসকোর্সের দিকে। সবার হাতেই বাশের লাঠি। বিকেল না হতেই রেসকোর্স ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হলো। একপর্যায়ে আমিও জনসমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেলাম। আজও মনে পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পাশের ময়দানে আমার অবস্থান ছিল। চারদিকে কোলাহল। ঘড়ির কাঁটা যখন দুপুর গড়িয়েছে ঠিক তখন মুজিবকোট গায়ে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু এলেন মঞ্চে। নেতাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিতে মুখরিত হলো জনসমুদ্রের আকাশ বাতাস। জনতার মুখে ধ্বনিত হলো তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব। মাইকের কাছে এসে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার সাত কোটি জনতা যেন একটি মাত্র অঙ্গুলি নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। ঢাকার বাইরেও সারা বাংলাদেশের মানুষেরা অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে রেডিওর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য। সেই দিন রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রিলে করার কথা ছিল। এক পর্যায়ে তা পাক সামরিক শাসকের নির্দেশে বন্ধ করে দেয়া হয়। ক্ষুব্ধ হয় রেডিওর বাঙালি কর্মচারীরা। তারপর জনতার চাপের মুখে সে ভাষণ রেডিওতে পরদিন প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ রাখলেন। চারদিকে জনতার উল্লাস। বিদেশি সাংবাদিকরাও আছে। মাইক থেকে একটা বজ্রকণ্ঠ ভেসে এলো—"ভায়েরা আমার"। সঙ্গে সঙ্গে হৈচৈ কোলাহল থেমে গেল। বঙ্গবন্ধু একাই ভাষণ রাখলেন। ভাষণের একপর্যায়ে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তখন মাথার উপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার ঘুরছে। সবার মনে ভয় ছিল এই বুঝি বোমারু বিমান দিয়ে সব ধ্বংস করে দেবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শেষ হবার পর প্রস্তুতি নিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। তার পর এলো সেই ২৫ মার্চের কালরাত। ১৯৭১ সালে ভুট্টো ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দিল বিশ হাজার বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করলে পূর্ব পাকিস্তান ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু এর ফল হলো উল্টো। বাংলার আপামর জনতা অস্ত্র হাতে নিয়ে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমিও মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলাম।

একটি জাতির জন্ম

মে. জে. জিয়াউর রহমান

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মিঃ জিন্নাহ যে দিন ঘোষণা করলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আমার মতে ঠিক সেদিনই বাঙালি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির। পাকিস্তানের সৃষ্টা নিজেই ঠিক সেদিন অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন, এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেলো তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামির। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তির উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগররূপে। অতিপ্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে এবং হানাদার, দখলদার, দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যুবাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে– বর্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিনকয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার।

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙে দু-ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচি। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাশ করি মেট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেটরূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানি বাহিনীতে।

স্কুলজীবন থেকে পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অসচ্ছলতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনেই বহুদিন শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণ সমাজেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতর মানব জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে আঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুলজীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানব। সযত্নে এই ভাবনাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো, জোরদার হলো। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্ক্ষাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনে আমি তখন করাচীতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন। পাকিস্তানি সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী সরকারী কর্মচারি, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালিদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো বাঙালি জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও। কেউ বলতো ভেঙ্গে দাও এর শিরদাঁড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের

উপর ছড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকরূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নিচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়ালো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে আন্দোলিত হলাম আমরা সবাই। পর্বতেঘেরা অ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা, বাঙালি ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাধ ভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমি ক্যাফেটেরিয়ার নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়। এ ছিল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানি ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না, ঠিক হলো এর ফায়সালা হবে মুষ্ঠিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লোভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানির গোয়ার্তুমির মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানি ক্যাডেট নাম তার লতিফ (পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন সে লে. কর্নেল) লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানি আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো, সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতেও বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটিকয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো অসম্মান করতো। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা।

আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমির ক্লাসগুলোতেও সবসময়, বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমন কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের সবসময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানি অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর শোভনীয় নিয়োগ পত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানিদের ভাগ্যে বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালি অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের সংগ্রামের।

এরপর হলো আয়ুবী দশক। আয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উনয়ন দেশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার । বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ; আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের -বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উৎপাদন হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক একসময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার সরকারি অভিমত সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তিনি। একপর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ংভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাইছিলেন বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটালিয়ন এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেম কারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটালিয়নই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটালিয়নের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানি ছিল আমার আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ ইনফ্যান্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাডালবীর (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানির জওয়ানরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহু সংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করে ছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিক। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করে এই কোম্পানি অর্জন করেছিল সৈনিকসুলভ মর্যাদা, প্রশংসা পেয়েছিল তাদের প্রীতির। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে । আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচুমানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটি হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মতো দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানিরা ভাবতো বাঙালিরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালি জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই বরং লেজগুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ

হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানিরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি সৈনিকের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগেছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালি জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বে ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেও এক পরম প্রিয় সম্পদ। এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালিদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালি সৈনিকের মনে। বিমানবাহিনীর বাঙালি জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোনো বাহিনীর মোকাবিলায়ই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারি মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমিতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানিদের আমি সমর বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমিতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানিদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানিদের দেখেছি বাঙালি ক্যাডেটদের কোনঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালি ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালি ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে, রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যাত করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমিতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম।

আমি ব্যাপক পড়াশোনা করলাম। ।১৯৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক যুদ্ধজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একট সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিলো বাঙালিদের।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের আমি ছিলাম সেকেন্ড ইন কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানি। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করল, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করল। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলেছে তা জেনে শুনেই বলছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কী জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালি নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি, এসকল খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে

সে জানায় ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে। গতি যে সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি বুঝতে পারি। সেই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানি যাই। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এর রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়।

পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক অ্যাটাচি কর্নেল জুলফিকার সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অ্যাটাচির সাথে কথা বলছিল। এই ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচির দৈনিক পত্রিকা ডনের একটা সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষণা ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসার বলছিল নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি। এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বলল, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা অন্যান্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে।

এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড। এর কয়েকদিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানি অফিসাররা মনে করতো, চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতঙ্কের ছবি। তাদের এই আতঙ্কের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালি অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটালিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটালিয়ান। এটার ঘাঁটি ছিল ষোলশহর জওয়ানের এক আগামী দল। অন্যেরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তারমধ্যে ছিল তিনশত পুরনো ৩০০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারি মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো

ব্যাটালিয়ানের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারিদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারি বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারিদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দিয়ে দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো বিহারিরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে, এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো। এই সময়ে আমার ব্যাটালিয়নের এনিসওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম, লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানালাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালি পাড়ায়, নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালিদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালিকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম, আমাকে হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালি হত্যা ও বাঙালি দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো আসতে থাকলো তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো।

সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানি নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পাকিস্তানিদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করল। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন আলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লে. কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দুদিন পর ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলাম। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনা বললাম।

এরমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীও তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো ২১ মার্চ জেনারেল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল ফাতমীকে বললো—ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনে ছিলাম।

২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার

সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুলসংখ্যক বাঙালি। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়ে ছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনী ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌ-বাহিনীর (পাকিস্তানি) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন পাকিস্তানি অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতোই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদ আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমেদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল, কানে কানে বললো 'তার ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করছে'। এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ান তৈরি রাখতে আমি আসি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানি অফিসার, নৌবাহিনীর চিফ পোস্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানি অফিসারটির দিকে তাক করে, বললাম হাত তুলো সে আমার কথা মানলো। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জিপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম।

তার বাসায় পৌছে হাত রাখলাম কলিংবেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিলো দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পরলাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়ানে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাতে মিলালো। ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানি অফিসারকে বন্দি করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লে. কর্নেল এ আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে তাকে অনুরোধ জানালাম, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কমিশনের ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে রক্ত আক্ষরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখবে ভালোবাসায়। এই দিনটি তারা কোনোদিন ভুববে না। কে নোদিন না।

বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে জেগে উঠলো বাংলার মানুষ
তোফায়েল আহমেদ

মার্চ এলেই ইতিহাসের মহামায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তার সেই ৭ মার্চের নয়ন জুড়ানো স্বাধীনতার মহাকাব্যপাঠের দৃশ্য। অমন দৃশ্যপট আর জাতির জীবনে আসেনি। আর কখনোই আসবে না অমন অহঙ্কারের সোনালি দিন।।

৭ মার্চে সমস্ত জাতির হৃদয়ে দোলা লাগাতে পারেনি। মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক দোলা লাগিয়েছিল। সেই অগ্নিঝরা ইতিহাসের উত্তাল মার্চ, অসহযোগ আন্দোলনের উর্মিমুখর দিনগুলো আজও চোখে ভাসে। বাঙালি জাতির তাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে স্বাধীনতার মন্ত্রে এক সুতোয় বাঁধা পড়ার দিন ৭ মার্চ। সেদিনই তার অঙ্গুলি হেলনে পাকিস্তানের পতন ঘটেছিল। বজ্রচেরা কণ্ঠের ডাকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা জেগে উঠেছিল। তার বাঁশির সুর নগর থেকে গ্রামের মেঠোপথে মানুষের হৃদয়কে মুক্তির নেশায় জাগিয়েছিল। রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সেদিন সকাল থেকেই বিক্ষুব্ধ বাংলার জনগণ এক স্রোতে এসে মিশে ছিল মঞ্চ ঘিরে। সে কী উন্মাদনা! কী উত্তেজনাময় দিনটাই না ছিল বাঙালি জাতির জীবনে! এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার স্বপ্ন সামনে রেখে কী বলবেন তাঁর জনগণকে ? এই প্রশ্নটিই ছিল সবার কৌতূহলী মনে।

একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যারা সংগ্রাম করে, শত অত্যাচার, নির্যাতনের দুঃসহ যন্ত্রণা তাদের গতিপথকে রোধ করতে পারে না, তাই কারাগারের অন্ধকার নিঃসঙ্গ মুহূর্তেও নয়, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকদের কাছে মাথা নত করেননি। কোনো কিছুই তাকে তার অঙ্গীকার আর লক্ষ্য থেকে সরাতে পারেনি।

৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেছিলেন।

১ মার্চ হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সভা। সকাল ১০ টা থেকে বৈঠক শুরু হয়। একই দিন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, 'যদি তার পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে ৩ মার্চ অধিবেশন বসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জীবনযাত্রা নীরব-নিথর করে দেয়া হবে।' এর পরপরই বেলা ১টায় ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেন, 'পাকিস্তান এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করছি।' এই ঘোষণার পর উত্তাল ঢাকা যেন দাবানলের মতো জ্বলে উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ থেকে ছাত্ররা বের হয়ে এলো। ঘর থেকে জনতা ছুটে এলো। পল্টনে যেন জনসমুদ্র।

হোটেল পূর্বাণীর চারদিকে জনস্রোত। ঢাকা শহরে শ্লোগান আর শ্লোগান। 'জাগো জাগো-বাঙালি জাগো, 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, সোনার বাংলা মুক্ত করো', 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা; 'পাঞ্জাব না বাংলা, বাংলা-বাংলা।' আমি তখন ২৭ বছর বয়সের একজন জাতীয় পরিষদ সদস্য। ইয়াহিয়ার ঘোষণায় জনতার রুদ্ররোষে ঢাকা হয়ে পড়ে অচল নগরী। হোটেল পূর্বাণীতে দেশ-বিদেশের অগণিত সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায়। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা নিয়ে সাংবাদিকদের বললেন, 'বিনা চ্যালেঞ্জে আমি কোনো কিছুই ছাড়ব না। ৬ দফার প্রশ্নের আপস করব না। ২ তারিখ থেকে ৫ তারিখ প্রতিদিন বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল চলবে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা হবে'। ওই দিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হলো ছাত্রলীগ আর ডাকসুর সমন্বয়ে। নেতৃত্বে ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। আজকাল অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি ইতিহাস বিকৃতির ধারায় কেউ কেউ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে এড়িয়ে নিজেকে বড় করে দেখান। স্বাধীনতার সংগ্রামের সেই অগ্নিমুখর প্রতিটি দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ হতো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন—ইতিহাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জায়গা পাওয়ার প্রতিটি আলোকিত ঘটনাই ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। তখন বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে সামনে নিয়েই পথ হেঁটেছে। আমরা শুধু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সেদিন কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছি। ইতিহাস বিকৃতির আস্ফালন দেখি আর ভাবি-আদর্শচ্যুত হলে মানুষ বোধহয় এভাবেই মিথ্যার মোড়কে সত্যকে গোপন করতে

চায়। ৭ মার্চ স্বাধীনতার ডাক এসেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সুমহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করেছিল। যারা আজ ইতিহাস বিকৃতি করছে, তাদের জন্য ইতিহাস কাঠগড়া নির্ধারণ করছে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশ। কী স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের স্রোত। বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীন বাংলাদেশ তখন সবার হৃদয়ে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা আঁকা জাতীয় পতাকা উত্তোলন হলো। ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ উত্তাল রূপ নিল। বঙ্গবন্ধু এলেন, তুমুল করতালি আর স্লোগানের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীন বাংলার ইশেতেহার পাঠ হলো। জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা পরিবেশন ও প্রদর্শিত হলো। ইস্তেহারে বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়। এদিকে ৫ মার্চ পর্যন্ত টানা হরতাল, চলমান অসহযোগ আন্দোলনের মুখে রাজশাহী, খুলনা, রংপুর ও চট্টগ্রামে শাসকের বুলেটে রক্তাক্ত হলো বাংলা। সান্ধ্য আইন জারি হলে বীর বাঙালি তা-ও অমান্য করল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি জাতি এতোটাই অবিচল আস্থায় স্বাধীনতার মন্ত্রে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল যে, তাদের আর রুখে দাঁড়ানোর সাধ্য শাসকের নেই। বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে মৃত্যুকে জয় করে রাজপথে নামার সাহস যেন বীর বাঙালি অর্জন করেছে। প্রতিদিন ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে মিলিত হতে থাকে জনতার মিছিল। যেন ওটাই বাঙালির ঠিকানা। নেতার নির্দেশ নিয়ে তারা আরো বেশি সংগ্রামমুখর হয়। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এস এম আহসানকে সরিয়ে বেলুচিস্তানের কসাইখ্যাত, টিক্কা খানকে গভর্নর করেন। ১০ মার্চ ইয়াহিয়া খান গোলটেবিল আহ্বান করলে বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করেন। ২৫ মার্চ ডাকেন জাতীয় পরিষদর অধিবেশন। আর বীর বাঙালির মাঝে তখন রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক কী নির্দেশ দেন তা শুনতে, দেখতে রক্তে নেশা ধরানো উন্মাদনা।

'৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচন। ১২ নভেম্বরের সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ হয় ১৭ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু আমাকে এই সুযোগে তাঁর নির্বাচনী সফরসঙ্গী করেন। আমার জীবনে অমন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড় মাপের হৃদয়বান নেতার সান্নিধ্য আর আসবে না ভাবলেই মন খারাপ করে। বঙ্গবন্ধুকে ওই সময়ে কাছ থেকে দেখেছি, তাঁর চিন্তা-চেতনায় স্বাধীনতা ছাড়া কিছু ছিল না। নির্বাচনে ১৬৯ আসনের ১৬৭ আসনেই জনগণ নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে আমাদের নয়, সেদিন বঙ্গবন্ধুকেই নির্বাচিত করেছিল। আমরা কেবল জাতির আস্থার প্রতীক বঙ্গবন্ধুর

প্রতিনিধি ছিলাম মাত্র। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার পথে হাঁটছেন তা পাকিস্তানি শাসকচক্র আর জুলফিকার আলী ভুট্টো বুঝতে পেরেই বাঙালির অবিসংবাদিত নেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। কিন্তু ইতিহাসের চিরসত্য হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রতি জনগণের বিশ্বাস, জনগণের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার আর প্রিয় মাতৃভূমির সঙ্গে তিনি

কোনোদিন প্রতারণা করেননি। যার জন্য ইয়াহিয়া ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। আজ ৭ মার্চের সেই দিনটির কথা ভাবলে কত অবাক হই। বঙ্গবন্ধু সেদিন নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র বীরের জাতিতে পরিণত করেন। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে ছুটে আসা ১০ লাখেরও বেশি জনতা যেন ছিল প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একেকজন দূত। সেদিন স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার উন্মাদনা ছড়িয়েছিলেন। সেই উন্মাদনা গোটা জাতির রক্তে ছড়িয়েছিল। নেতা জানতেন তাঁর মানুষের ভাষা। জনগণ বুঝত নেতার ইশারা। নেতার কণ্ঠের মাধুর্য তাদের জানা ছিল। তাই জাতি সেদিনই নেতার ডাক পেয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

৭ মার্চ সকাল থেকেই সারা দেশের জনস্রোত এসে মিলিত হতে থাকে রেসকোর্স ময়দানে। রেসকোর্স ময়দানে যেন বিক্ষুব্ধ বাংলার চিত্র। সেদিন তাদের প্রিয় নেতা হৃদয় আর বিশ্বাস থেকে যে ডাক দিয়েছেন, তা তারা সানন্দে গ্রহণ করেছে। সকাল থেকেই কী এক উত্তেজনায় টালমাটাল দেশ। কী বলবেন আজ বঙ্গবন্ধু? এই প্রশ্ন নিয়ে লাখ লাখ জনতার মিছিল ছুটে আসে রেসকোর্স ময়দানের দিকে। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে দৃঢ়তার সঙ্গে আপসহীন অবয়ব নিয়ে নেতা এসে দাঁড়ালেন জনতার মঞ্চে।

জনতার হৃদয়ে যেন আকাশ স্পর্শ করার আন্দে দোলা দিয়ে গেল। নেতা যখন মঞ্চে উঠলেন, মনে হলো আমরা হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছি তার সেই দুনিয়া-কাঁপানো ভাষণ। গ্যাটিসবার্গ অ্যাড্রেস বলে খ্যাত অমন সাজানো-গোছানো নির্ভুল ছন্দোবদ্ধ প্রাঞ্জল উদ্দীপনাময় ভাষণটি তিনি রাখলেন। কী আস্থা তার প্রিয় স্বদেশের মানুষের প্রতি, প্রধানমন্ত্রিত্ব, এমনকি জীবনের চেয়েও কত বেশি প্রিয় তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা তাই তিনি শোনালেন। এতটাই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন যে, ভাষণে তিনি একদিকে স্বাধীনতার ডাক দিলেন, অন্যদিকে শাসকের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করার পাতানো ফাঁদেও পা দিলেন না।' এবারের সংগ্রাম

মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' যেমন বললেন, তেমনি চার শর্তের জালে ফেললেন শাসকের ষড়যন্ত্রের দাবার ঘুঁটি। বললেন, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে। সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে। গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। রক্তের দাগ না মোছা পর্যন্ত অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার কথাটিও বললেন। ক্যান্টনমেন্টে তখন গুলিবর্ষণ, বোমা হামলার প্রস্তুতি। কিন্তু নেতার বিচক্ষণতায় রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হয়।

৭ মার্চের ভাষণ নয় যেন মহানায়কের বাঁশিতে উঠে আসা স্বাধীনতার সুর। সেই সুরে বীর বাঙালির মনেই নয়, রক্তেও সশস্ত্র স্বাধীনতার নেশা ধরিয়ে দেয়। ভাষণটি বঙ্গবন্ধু নিজ সিদ্ধান্তেই দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের সহযাত্রী বেগম ফরিলাতুন্নেছা মুজিব জানিয়েছিলেন, ৬ মার্চ সারা রাত বঙ্গবন্ধু বিচলিত-অস্থির ছিলেন, তিনি কী বলবেন তার জনগণকে তা নিয়ে। বেগম মুজিব বলেছিলেন, 'তুমি যা বিশ্বাস করো তাই বলবে।' সেই দিনটির কথা মনে পড়লে এখনো শরীরে শিহরণ জাগে। মনে হয় বঙ্গবন্ধু যদি আবার ডাক পাঠাতেন, আবার যুদ্ধে যেতাম। এখনো কানে বাজে। নেতা বলছেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের অধিকার চাই'।

কত স্মৃতি ভাসে। কত সুখের স্মৃতি। কত বেদনার স্মৃতি। ৭ মার্চের স্মৃতি অমলিন। মঞ্চে যখন বঙ্গবন্ধু এসে উঠলেন, মনে হলো এই দিনটির জন্য বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের সংগ্রাম আর অপেক্ষা। মনে পড়েছিল সেই কথাটিই, 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'। বঙ্গবন্ধু এলেন, দেখলেন, আর হৃদয় জয় করে ফিরলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ছাত্র ইউনিয়ন

নুরুল ইসলাম নাহিদ

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির হাজার বছরের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের প্রজন্মের সৌভাগ্য যে, আমরা তখন ছিলাম তরুণ। তাই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিলাম। আমাদের দেশের তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমার আরেক সৌভাগ্য যে, আমি সেই ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম। সেজন্যেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করা এবং সক্রিয় অবদান রাখার সুযোগ হয়েছিল আমার।

তখন প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠন ছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। আমি ছাত্র ইউনিয়নের তখন সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। আমি মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেছিলাম। মার্চ মাস আমাদের জাতির জীবনে সবচেয়ে ঘটনাবহুল মাস। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছিল কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান-শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দেয়ার, এমনকি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে না ডাকার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এই ইস্যুতেই দেশে তখন চরম উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে এদেশের নেত্রবৃন্দের সাথে আলোচনা করার জন্যে বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ন্যাপের (ওয়ালি-মোজাফফর) নেতারা ঢাকায় এসেছেন। '৭১-এর ১লা মার্চ নিউমার্কেটের হকার্স মার্কেটের দোতলায় ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা চলছিল। আমরা ছিলাম মধুর ক্যান্টিনে। দুপুর সাড়ে ১২টায় আমরা তিনজন; আমি, শামসুদ্দোহা ও 'সংবাদ'-এর বর্তমান সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত। সেখানে অবস্থান করাকালীন দুপুর ১টায় রেডিও পাকিস্তানের খবর শুনলাম।

ঘোষণা করা হলো—জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। আর এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পরিস্থিতি আর স্বাভাবিক গতিতে চলবে না।

খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এর প্রতিবাদ মিছিল বের করার পরিকল্পনা নিয়ে ন্যাপ অফিস থেকে রওনা হলাম। জহুরুল হক হলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে হলে আর পৌঁছতে হয়নি। দেখলাম, রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোকজন নেমে এসে স্লোগান দিচ্ছে : 'পাকিস্তানে লাথি মার, স্বাধীন বাংলা কায়েম কর।' শুরু হলো মিছিল-মিটিং। সবদিক থেকে মিছিল এলো পল্টন ময়দানে। মিটিং হলো, বক্তৃতা হলো। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। সমগ্র জাতির দৃষ্টি তখন বঙ্গবন্ধুর দিকে, তিনি কী ঘোষণা দেন? বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ৭ মার্চ জনসভাসহ কর্মসূচি ঘোষণা করলেন।

এই পটভূমিতে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। সে জনসভায় আমিও ছিলাম। ভাষণের আগে যেমন বঙ্গবন্ধু কী ঘোষণা দেন তা শোনার জন্যে অধীর আগ্রভরে অপেক্ষা করছিলাম, তেমনি বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ছিল জাতির মনের কথা ও প্রতিধ্বনি। তার ভাষণের সাথে সমস্ত জনসভা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। একেকটি বাক্য শেষ, সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি। তিনি যখন ঘোষণা করলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন গোটা জাতিই তাঁর এই ঘোষণাকে প্রকৃতপক্ষেই স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে নিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকেই সকল আন্দোলন সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল ঠিক। তবে '৭১-এর মার্চ মাস ছিল চূড়ান্ত ও বাস্তব প্রস্তুতিপর্ব । স্বাধীনতার জন্যে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণী ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে—বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে আমরা সে দিকনির্দেশনা পেয়েছিলাম। রাজনৈতিক ও মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্যে চূড়ান্ত প্রস্তুত হয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু সশস্ত্রভাবে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি তখনো ছিল না। যার জন্যে তখন আমাদের দৃষ্টি বেশি করে দিতে হয়েছিল সেই ধরনের প্রস্তুতির দিকে।

স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে যে সকল তৎপরতা চালানো হয়েছিল আমি তার কিছু দিক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। একথা এখানে বলারই প্রয়োজন নেই যে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সবসময়,

সকল আন্দোলনে ঐক্য ও সমঝোতা ছিল আমাদের ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা তখন পৃথক পৃথকভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেও দু'সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে ছিল গভীর যোগাযোগ ও সহযোগিতা। আর সবার ওপর ছিল বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনা ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তবে ছাত্র ইউনিয়নের এসকল তৎপরতায় পেছন থেকে আরো যিনি ভূমিকা ও অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন প্রয়াত কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ। তৎকালীন পরিবেশে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে ছাত্র সমাজের সঙ্গে জনগণের মানসিক ও বাস্তব সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যেও কর্মসূচি গ্রহণ করি। ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায় সমস্ত নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে জনগণের মধ্যে বিশেষ করে তরুণ সমাজকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া শুরু করি।

এ কথা সত্য যে, তখন আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে ছাত্রদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, যা আজকের প্রেক্ষাপটে অবাস্তবই মনে হবে। তাই ৭ মার্চের পর থেকেই প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে কাঠের বন্দুক দিয়ে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন ছাত্র ও বর্তমান বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আবুল কাশেম মিয়া ছিলেন তার প্রশিক্ষক। প্রতিদিন সকালে ২ ঘণ্টা করে এই প্রশিক্ষণ চলতো। প্রায় ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতো। তবে এই প্রশিক্ষণ দেখার জন্যে হাজার-হাজার মানুষ মাঠের চারপাশে এসে ভিড় করতেন। সেই সময়ে এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রভাব আজকের দিনে উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। মার্চ মাসের ২০ তারিখের দিকে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে রাজধানী ঢাকার রাজপথে আমরা রুট-মার্চও করেছিলাম। কাঁধে ছিল সেই কাঠের বন্দুক। এখানে বলে রাখা দরকার যে, ছাত্র ইউনিয়নের মতো ছাত্রলীগও একইভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। ওদের প্রশিক্ষণ চলতো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে।

এই প্রশিক্ষণ ও রুট-মার্চের সচিত্র প্রতিবেদন পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন ছাপা হতো। এর ফলে সমগ্র দেশে এর প্রভাব দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই প্রশিক্ষণকে অনুসরণ করে জেলা এমনকি থানা পর্যায়েও স্থানীয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। এর কারণেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় প্রভৃতি বিষয়গুলো সমগ্র জনগণের সামনে চলে এসেছিল।

তবে কাঠের বন্দুক দিয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সত্যিকার বন্দুক চালানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। 'আবু ভাই নামে প্রয়াত

কমরেড ফরহাদের এক বন্ধু ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে ডেমরার একটি এলাকায় সত্যিকার বন্দুক চালানোর প্রশিক্ষণ দিতেন। সেই আবু ভাইও আজ আর বেঁচে নেই।

৭ মার্চের পর এমন উন্মুক্ত প্রশিক্ষণ ও রুট-মার্চ সম্ভব হয়েছিল কারণ তখন বাংলাদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতোই সবকিছু পরিচালিত হতো। পাকিস্তানি শাসকদের বাস্তবে কোনো কর্তৃত্বই তখন এদেশে ছিল না।

দেশের সাধারণ মানুষকে এই প্রস্তুতিসহ সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে প্রতিদিন সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ হতো। লক্ষণীয় বিষয় ছিল, প্রতিদিনের এই সমাবেশে বিরাট জনসমাগম হতো। সেখানে আমরা বলতাম—আমাদের এখন কী করণীয়, পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে হামলা হলে কী করা উচিত, দেশে কী হচ্ছে ইত্যাদি সবকিছুই। অর্থাৎ ৭ মার্চের পর থেকে সকালে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণের পর ১১টায় সমাবেশ ও বিকেলে পাড়ায় পাড়ায় যোগাযোগ, সমাবেশ ও তরুণদের সংগঠিত করা এগুলো ছিল নিয়মিত কাজ।

ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ মূলত সাংগঠনিকভাবে অনেক আগে থেকেই স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুতি চালিয়ে আসছিল। '৭১-এর জানুয়ারি মাসে ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ডেকে ঘোষণাপত্র পরিবর্তন করেছিল। সেই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল : 'আমরা প্রত্যেকটি প্রদেশের স্বাধীন হবার অধিকারসহ স্বায়ত্তশাসন চাই'। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি সমাবেশ হয়েছিল। বর্তমান 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত তখন ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসেবে সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, ওই ফেব্রুয়ারি মাসেই চেকস্লোভাকিয়ার ব্রাতিসলাভায় আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। আমি আমাদের দেশ থেকে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সেই কংগ্রেসে অংশ নিয়েছিলাম এবং ওই কংগ্রেসে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমার উদ্যোগেই সেই কংগ্রেসে বাঙালি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ছাত্র সমাজের আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এর সুফলও পরবর্তীতে আমরা পেয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর প্রায় সাথে সাথেই বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন দিয়েছিল। ২৫ মার্চের আগে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা এবং বিরাজমান পরিস্থিতি আমাদের

সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার আর কোনোই বিকল্প নেই। তখন এরকম একটা ধারণাও আমাদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, যে কোনো সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী জনগণের ওপর হামলা করতে পারে। এই হামলা হলে আমরা যাতে প্রতিরোধ করতে পারি তারও একটা চেষ্টা আমাদের ছিল। মধুর ক্যান্টিনের পেছনে গোপনে আমরা বোমা তৈরি শুরু করলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই বোমা দিয়ে কালভার্ট উড়িয়ে দেব, যাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চলাচল করতে না পারে। ইটের স্তূপের মধ্যে বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষাও করা হলো। সেই বোমার বিস্ফোরণে আমাদের বুক আশায় ভরে উঠলো, যদিও বাস্তবে এটা ছিল খুবই নগণ্য; কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা সেই পরিস্থিতি আমাদের আবেগাপ্লুত করে তুলেছিল। সবশেষে বলবো, '৭১-এর পহেলা মার্চ থেকেই স্বাধীনতার পক্ষে সমগ্র জাতির যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল তারই প্রতিধ্বনি তুলে ৭ মার্চ রেসকোর্সে ময়দান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থে এটাই ছিল আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা। তার সেই ঘোষণা ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেই পরবর্তীতে প্রতিদিন চলেছে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার আবাহন

কামরুজ্জামান ননী

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বিজয় অর্জন এবং স্বাধীনতা লাভ। আর তা যদি হয় একটি ভাষণের মুল কারণ, তবে অবশ্যই তা হলো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। ১৯৭১ সালের ওইদিনে বিক্ষুব্ধ বাঙালি, উত্তাল পূর্ব বাংলা। ফুঁসে ওঠা গোটা দেশ ছুটছে লড়ছে জ্বলে উঠছে মিছিলে ময়দানে স্লোগানে রাজপথে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে চলছে ঘরহারা মানুষের রাজপথের শ্রোত। মানুষ ঘরে ফিরতে চায় না। অন্যদিকে তখন চলছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করছে। তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দেশ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । ওই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নিজামে ইসলাম একজোট হয়ে সামরিক জানতা ও শাসকগোষ্ঠীকে মদদ দিতে থাকে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ দেশের বড় বড় শহরে চলছিল গুলি। শিল্পাঞ্চলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ শহরগুলিতে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। বাঁধভাঙ্গা জনস্রোত রাস্তায়, অলিতে, গলিতে। হাট-বাজার ঘাট, শহর-বন্দর গ্রামে মানুষের এক অন্যরকম আর্জি, আকাঙ্ক্ষা আর চাওয়া। আর তা শুধু মাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে। তখন গোটা জাতির সামনে একজনই নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

তখন লেখা পড়ার স্থল হিসেবে খুলনায় আমার অবস্থান। খুলনা বিভাগীয় শহর এবং অন্যদিকে শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সমষ্টিবদ্ধ আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি। জেলা ছাত্র নেতৃবৃন্দের একজন। আমাদের খুব নৈকট্য ছিল ছাত্রলীগের সাথে। পৃথকভাবে হলেও অভিন্ন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করতাম। খুলনার শহর-বন্দর গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্রই আমরা

আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। প্রায় প্রতিটি স্কুল-কলেজ-হাট-বাজার-ঘাট পাড়া মহল্লায় আমরা সভা সমাবেশ করেছি।

দিন যায় দিন আসে। কিন্তু আন্দোলন কোন পথে, কী যেন নাই? ঠিক এই সময় ঘনিয়ে আসে ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন স্বাধীনতার ঘোষণা "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। সমগ্র জাতি একটা দিকনির্দেশনা পেল। বারুদে আগুন লাগার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামে ফেটে পড়ল গোটা জাতি। আন্দোলনের সকল স্রোতধারা প্রবাহিত হলো একটি মাত্র ধারায়, স্বাধীনতা। মুক্তিপাগল মানুষ দলবদ্ধ হলো, জোটবদ্ধ হলো একটি আকাঙ্ক্ষায়। বঙ্গবন্ধুর গোটা ভাষণ জুড়েছিল জাদুর ছোঁয়া। বঙ্গবন্ধু এক একটা বাক্য উচ্চারণ করেন, আর শ্রোতার লক্ষ্য করতালিতে মুখরিত হতে থাকে। এ যেন বক্তৃতার এক বিপ্লবী পংক্তিমালা। সংগ্রামের এক মহাকাব্য। এমন উজ্জীবনী ভাষণ আজ অবধি কেউ শোনেনি বোধহয়। রক্তে আগুন প্রবাহের মন্ত্রমুগ্ধ এক ভাষণ। ছাত্র বই ছেড়ে রাজপথে, শ্রমিক কারখানা বন্ধ করে রাজপথে। পুকুর খননরত মজুর কোদাল ফেলে মিছিলে। কৃষক লাঙ্গল ছেড়ে সভা-সমাবেশে, মাঝি বৈঠা ফেলে সংগ্রামে। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মুঠে-মজুর মাঝি-মাল্লা, কর্মজীবী শিক্ষক কবি শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সব এক কাতারে। শামিল মুক্তিযুদ্ধে। শুরু হয়ে যায় ট্রেনিং। প্রকাশ্যে এবং গোপনে। সংগ্রহ অভিযান চলতে থাকে অস্ত্রের। একদিকে ট্রেনিং অন্যদিকে অস্ত্র সংগ্রহ।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র ভাষণ জুড়েছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। বাঙালি জাতি অসহযোগ আন্দোলনে একাট্টা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতিটি উক্তি বাঙালি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। সব নদীর প্রবাহ যেমন একটাই—সাগর, তেমনি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সমগ্র ভাষণের একটাই দিকনির্দেশনা স্বাধীনতা। নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র হতে পারার একটা মূলমন্ত্র ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। একটা ভাষণ একটা জাতিকে কতটা উদ্বুদ্ধ করতে পারে তার প্রকৃষ্ট এবং একমাত্র উদাহরণ ৭ মার্চের ভাষণ। এর আগে পরে এমনটা আর ঘটে নাই।

খুলনা মুসলিম লীগ সমৃদ্ধ অঞ্চল হলেও আমি দেখেছি অনেক মুসলিম লীগ পরিবারের যুবক স্বাধীনতা যুদ্ধে শামিল হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়। বহুপরিবার পাকিস্তানি পক্ষ ত্যাগ করে জয়বাংলা অর্থাৎ বাঙালির পক্ষ নিয়েছে।

৭ মার্চের ভাষণের পর আমরা প্রকাশ্যে ট্রেনিং নিয়েছি। মানুষ দর্শক হয়ে করতালি দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। থানার বাঙালি কর্মকর্তারা অস্ত্র গোলাবারুদ

সংগ্রহে সহায়তা করেছে। বাঙালি যেখানেই কর্মরত ছিলেন সবাই এক মন্ত্রে মুগ্ধ। এমনিতেই গোটা জাতি ফুঁসেছিল, তারপর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। ঘৃতাহুতির মতো গোটা জাতি জ্বলে ওঠে। কণ্ঠে সবার জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। তোমার দেশ, আমার দেশ—বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তোমার নেতা আমার নেতা—শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। এক নেতা এক দেশ- বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। এই সব স্লোগানে মুখর ছিল সেই সময়টা।

১৯৭১-এর ২রা মার্চ খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কনিষ্ঠ হয়েও ঐ সভায় সভাপতিত্ব করার গৌরব হয়েছিল আমার। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এটি এম খালিদ হোসেন, নুরুজ্জামান বাচ্চু, আঃ রশিদ, প্রমুখ সহ ছাত্রলীগের ওই সময়কার তুখোড় ছাত্র নেতা নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেছিলেন। ওই সভা থেকেও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু যেন জাতিকে অচিরেই মুক্তির একটা যৌক্তিক নির্দেশনা দেন। গোটা জাতির এমনতর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বঙ্গবন্ধু ঘটিয়েছিলেন ৭ মার্চের ভাষণে। মুক্তি যুদ্ধের সবরকমের নির্দেশনা ছিল ওই ভাষণে।

খুলনার তৎকালীন ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ সমমনা অনেককে নিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলি। খুলনাতে খালিদভাই, জাহাঙ্গীর ভাই, মোতাহার ভাই, বাচ্চু ভাই, রশিদ ভাই, মনির ভাইসহ এদের নেতৃত্বে আমরা দুধের "ল্যাকটোজেন" কৌটা গুলিকে মাইন-বোমায় পরিণত করতাম। কিছু রাইফেল, বন্দুক, রিভলবার ইতোমধ্যে সংগ্রহ হয়ে গেল। প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি সামান্য এবং তুচ্ছ হলেও তখন আমরা এতেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। পিকচার প্যালেসের মোড়, বৈকালী সিনেমা হলের সম্মুখে রাস্তায় এবং খালিশপুর দৌলতপুর সড়কে টহলকৃত পাক্ বাহিনীর ওপর আমরা এগুলি প্রয়োগও করেছিলাম।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারীর শেষ দিক থেকে এবং মার্চ মাসের শুরুতেই গোটা বাঙালি জাতি লড়াই সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল। আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এর ৭ মার্চের রেসকোর্স-এর ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তির নির্দেশনায় সামিল করায় এবং এই ভাষণই ছিল স্বাধীনতার আবাহন, স্বাধীনতার ঘোষণা।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের আহ্বান
রণেশ মৈত্র

বাঙালি জাতির জীবনে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মাস মার্চ। আমি ১৯৭১ সালের মার্চের কথা বলছি। ১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির জীবনকে মহিমান্বিত করেছে, যেমন গৌরবান্বিত করেছিল ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি অস্ত্র হাতে নেয়নি। নিরস্ত্র এক কঠিন গণঐক্যের দ্বারা পূর্ববাংলার তরুণ ছাত্র-যুব সমাজ সেদিন পূর্ববাংলার উর্দুপ্রেমী বাংলাভাষী মুসলিম লীগ দলটিকে বাধ্য করেছিল বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে, যদিও তা কাযকর হলো ১৯৭১-এর মহান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অঢেল রক্ত ক্ষরণের মধ্য দিয়ে। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি তাই যেমন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কিছুটা রক্ত ক্ষরণের মধ্য দিয়ে যেমন শেষতক তৎকালীন ঘোর সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রতি জনপ্রিয় দাবিটি নীতিগতভাবে মেনে নিতেই বাধ্য করতে সক্ষম হয়নি—১৯৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাম্যমে মুসলিম লীগকে প্রকৃত অর্থেই পূর্ববাংলাতে পরিপূর্ণ বা আক্ষরিক অর্থেই জনবিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল এবং তা এতোটাই যে; ভাষা আন্দোলনের পর মাত্র দু'বছর যেতে না যেতেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ নামক ঐ সাম্প্রদায়িক দলটিকে স্থায়ীভাবে সমাধিস্থ করতে সক্ষম হয়েছে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে সেই যে সমাধিস্থ হলো মুসলিম লীগ। আজও এই দীর্ঘ ৫৪ বছর পরেও তা আর মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না। তাই দুটি বিজয় ১৯৫২ এবং ১৯৫৪ সালের দুটিই বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের কথা।

১৯৭১ সালের মার্চ আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব; জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাস। এই মাসেরই ৭ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন আমাদের জাতির মুক্তিসংগ্রামে;

স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে যার যা আছে তাই নিয়ে। সে আহ্বানের মর্যাদা বাঙালি জাতি লাখ লাখ পোণের বিনিময়ে হলেও অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছে। ঐ ভাষণের পর মাত্র তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়নি। অথচ এসে গেল স্বাধীনতার যুদ্ধ বাঙালি জাতির দুয়ারে।

২৫ মার্চের কালরাতে বিন্দুমাত্র কোনো কারণ ছাড়াই পাকিস্তানের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে পুরোপুরি বিনা উস্কানিতেই ঝাপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতির ওপর পৃথিবীর নির্মমতম এক উদাহরণ সৃষ্টি করে। ঐ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানায় ইপিআর (বর্তমানে যে বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস বা বিডিআর হেডকোয়ার্টার) আর সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গর্বিত সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করল। রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত নগরীতে কান্নার রোল ওঠেছিল। নতুন প্রজন্মের বাঙালির কাছে আজ তা অনেকটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে এক ভয়াবহ হিংস্র আক্রমণ? মানুষ যে কত অমানুষ হতে পারে, কত নির্মম, বর্বর, অসভ্য জানোয়ারতুল্য হতে পারে তা সেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালি জাতি, তথা বিশ্ববাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। ওই এক রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন সম্মানিত শিক্ষক, অগণিত ছাত্রছাত্রী, হাজার হাজার পুলিশ বাহিনীর সদস্য, ইপিআর বাহিনীর অফিসার ও জোয়ান গুলিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছিল। বাংলার শ্যামল মাটিতে তাজা রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল তারা। বীর বাঙালি জাতি এই বর্বরতার জবাব দিতে, তার প্রত্যুত্তর দিতে মোটেও বিলম্ব করেনি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর তারা লাখে লাখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যার যা আছে তা নিয়েই। প্রাণ দিয়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে, নারী সম্ভ্রম বিলিয়েছে, লুটপাটের শিকার হয়েছে কোটি কোটি পরিবার। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তারা ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে। পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে কী ঘটেছিল? নতুন প্রজন্মকে জাতীয় ইতিহাসের সেই গৌরবজনক অধ্যায় জানানোর জন্যই মার্চ মাসের কথা দিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম। আগেই বলেছি ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন এবং ২৫ মার্চের কালো এবং বিভীষিকাময় রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিষ্ঠুর বর্বরতার সঙ্গে গোটা বাঙালি জাতির ওপর সর্বাধুনিক অস্ত্র হাতে। কিন্তু আর তারও আগে বঙ্গবন্ধুরই আহ্বানে বাঙালি জাতি চালিয়ে যাচ্ছিল

সর্বাত্মক অসহযোগতিার আন্দোলন । বাঙালি তো আন্দোলনের জাত, সংগ্রামের জাত, দেশের জন্য অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দেয়ার জাত। তাই তারা সেই অসহযোগ আন্দোলন গোটা দেশব্যাপী চালিয়ে গিয়েছিল সর্বাত্মকভাবেই। বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল সেই অসহযোগ আন্দোলন। যা অব্যাহত গতিতে চলেছিল দেশব্যাপী। বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থেই অচল হয়ে পড়েছিল মার্চের প্রথম থেকে শুরু করে প্রায় শেষ অবধি। বন্ধ ছিল অফিস-আদালত, ব্যাংক, যানবাহন, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার সব কিছুই। না, তখন একটি চুরির ঘটনাও শোনা যায়নি, ডাকাতির ঘটনাও না, না কোনো খুন-খারাবির ঘটনা। সমগ্র বাঙালি জাতি সেদিন মানুষে পরিণত হয়েছিল, সকল বিভেদ ভুলে গিয়েছিল—ধর্মীয় বিভেদ, অর্থনৈতিক বিভেদ, সামাজিক বিভেদ সকল কিছু যা একটি জাতিকে দুর্বল করে রাখতে পারে তার সব কিছুই। সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে গড়ে তুলেছিল ব্যাপকতম ঐক্য, যে ঐক্য কেউ কখনও দেখেনি।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাইলফলক

খালেদ মাহমুদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঘোষণাই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম কবিতা। শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক এই ঘোষণা বাঙালিদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। সেই নজিরবিহীন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামকে গলাটিপে হত্যা করতে পাকিস্তানি সশস্ত্র জল্লাদবাহিনী দেশপ্রেমিক বাঙালিদের ওপর পাগলা কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সকল প্রকার হত্যা, ষড়যন্ত্রের নীলনকশা পাকাপোক্ত করে জুলফিকার আলী ভুট্টো '৭১-এ ঢাকা থেকে করাচি বিমানবন্দর গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে বললেন—গড সেইভড পাকিস্তান। ২৫ মার্চ অতর্কিতে ইয়াহিয়ার নির্দেশে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ, নিরীহ বাঙালিদের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা শুরু করা হলে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই নির্দেশনামাটি তৎকালীন মগবাজার টেলিফোন অফিস থেকে যে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ওয়্যারলেসের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন যিনি পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে কাস্টমস কমিশনার হয়েছেন (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)। সেই আবদুল কাইয়ুম সাহেব একাধিক সাক্ষাতকারে আমাকে ওই ঘটনার কথা বলেছেন।

আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত লেখকরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির জনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজনৈতিক বিশ্লেষক মরহুম এম আনিসুজ্জামান তার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু গ্রন্থে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়—একটি ইতিহাস। যে মহানায়কের জন্ম না হলে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের এই স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় কখনও ঘটতো না এবং বাঙালিরা একটি স্বাধীন জাতি

হিসেবে বিশ্বসভায় কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো না, তিনিই শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালিরা তাকে ভালবেসে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করে ধন্য হয়েছে।

দেশের জ্ঞান-গুণী, লেখক-সাংবাদিকরা এ কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন যে, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণটি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাইলফলক। এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটির মধ্যদিয়ে বাঙালির ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা, নির্যাতন, '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের রায় বানচাল তথা ২৩ বছরের পাকিস্তানি জান্তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অধিকার হারা বাঙালিদের স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের এক চূড়ান্ত আহ্বান উচ্চারিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটির শেষ কথা ছিল এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ ভাষণটির সফল পরিণতির পথ ধরে সমগ্র বাঙালি জাতি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিল এবং সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণসহ সার্বিক জাতীয় স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং তদানীন্তন পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) প্রত্যন্ত অঞ্চলে জয় বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি দিয়ে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলেছিল। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় ইপিআর ক্যাম্পে বাঙালি পুলিশ এবং আধা-সামরিক সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ রাত ১২টার পর গ্রেফতারের আগে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত ঘোষণা দেন। ঘোষণাটি ছিল এরকম 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অতর্কিত পিলখানায় ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরে লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা, চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোষ নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে

বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী, অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা—শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ও ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণার বাণী প্রচারের ধারাবাহিকতার মধ্যদিয়ে দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি হায়েনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষের আত্মাহুতি এবং দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৯১,৫৪৯ (একানব্বই হাজার পাঁচশত উনপঞ্চাশ) সৈন্যসহ মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মার্চে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণটি এমন উদ্দীপক এবং তাৎপর্যময় বাস্তবতার স্বাক্ষর বহন করে যা শতাব্দী থেকে শতাব্দী অবধি শুধু এ কথাটি প্রমাণ করবে যে, এই ভাষণটি উচ্চারিত না হলে হয়তোবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মর্মবাণী বিকশিত হতো না এবং এ ভাষণটিই সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি এ যাবতকালের পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ।

৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

একটি জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাক থাকে। নানা ঘটনার ঘনঘটা এই বাঁকগুলোকে স্মৃতিময় করে রাখে। নতুন প্রজন্মের জন্য ছড়িয়ে দেয় প্রেরণা। ইতিহাসের পাতায় অনন্য সংযোজন হয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলার ইতিহাস সোনালি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। এই ঐতিহ্যের প্রেরণা একটি জাতিকে নতুনভাবে জাগিয়ে দিতে পারে। এগিয়ে নিতে পারে সুন্দর সম্ভাবনার দিকে। তবে এর জন্য চাই যোগ্য কাণ্ডারি অর্থাৎ নেতৃত্ব। এ জায়গাটিতেই বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে আমাদের প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে দুর্বৃত্ত রাজনীতি। না হলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এর ঐতিহাসিকতা প্রজন্মের জন্য সঠিক আলোকবর্তিকা হতে পারে। কিন্তু একে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। কিন্তু ইতিহাসের সত্য ফিরে আসেই। মূর্খই শুধু ইতিহাসকে অস্বীকার করে।

৭ মার্চের ভাষণ ছিল সমকালীন রাজনীতির এক অনিবার্য পরিণতি। বাংলার ইতিহাসের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা জানেন এ মাটি পরাভব মানেনি কোনোকালে। খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার অব্দে বাংলার মানুষ—অস্ট্রিক, নিষাদ, সাঁওতালরা আর্য আগ্রাসনকে থামিয়ে দিয়েছিল। আর্য গ্রন্থ এ মর্মজ্বালা ভুলতে পারেনি। ভারত গ্রাস করে বাংলার প্রতিরোধে থমকে যাবে—এমনটি ভাবা খুব কঠিন ছিল। তাই মুখ রক্ষার জন্য গল্প ফেঁদেছে। বলেছে অস্পৃশ্য বর্বর দেশ বাংলা। এখানে মানুষ পাখির মতো কিচির মিচির করে কথা বলে। নীল রক্তের ধারক আর্যরা তাই ইচ্ছে করেই প্রবেশ করেনি বাংলায়। এ ধরনের ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়ার মধ্যে প্রভুত্ব করার বাসনা সুপ্ত থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেমন তরুণ সমাজকে শেখাতো বাঙালিকে ঘৃণা করতে। নিকৃষ্ট জাত হিসেবে বিবেচনা করতে। এসব শাসক-পাকিস্তানিদের প্রেতাত্মারা এখন চেষ্টা চালায় বাঙালির

গৌরবের দিন-ক্ষণগুলো ধোয়াচ্ছন্ন করে দিতে। সেদিন যেমন বাংলার মানুষের বীরত্বগাথাকে আড়াল করতে চেয়েছিল আর্যরা তেমনি ৭ মার্চের ভাষণের মহিমা ভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়ার কসরৎ কম হয়নি এদেশের রাজনীতিতে।

বাংলার ইতিহাসে যেসব গৌরবগাথা প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে ৭ মার্চের ভাষণকে তা থেকে বিযুক্ত করার উপায় নেই। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাধারণ সূত্র বলবে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধের আর কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না। অন্যদিকে ৭ মার্চের ভাষণটিও হঠাৎ কোনো বিস্ফোরণ ছিল না। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতাই জন্ম দিয়েছিল ৭ মার্চের।

বাঙালি—বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষার ভেতর থেকেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। হাত মে বিড়ি মে পান/লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, বাঙালির প্রিয় স্লোগান ছিল। কিন্তু কজন ভাবতে পেরেছিল দ্রুত স্বপ্নভঙ্গ হবে তাদের। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র ইংরেজদের মতো মেধাবী ঔপনিবেশিক শাসক হতে পারলো না। চরিত্র পেলো প্রাচীন বাংলার নিকৃষ্ট মানসিকতার ব্রাহ্মণ সেন শাসকদের মতো। ইংরেজরা ভারতবর্ষের রাজত্ব হাতে নিয়ে বুঝতে পেরেছিল বহু ভাষা আর সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের দেশ ভারতে শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হলে এখানকার ধ্রুপদী সাহিত্য অধ্যয়ন করা জরুরি। ভারতে ইতিহাস ঐতিহ্য অধ্যয়ন করে ভারতবাসীর মনস্তাত্ত্বিক দিকের খোঁজ করেছে শাসকগোষ্ঠী। মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি না করে প্রায় একশ বছর অর্থাৎ ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফার্সিকেই রেখেছে রাজভাষা। আর পাকিস্তান সৃষ্টি ক্ষণেই ভাষা প্রশ্ন বিতর্ক তুলে ফেলেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা। তাই ওই স্থূল মেধার পাকিস্তানি শাসকরা সন্দেহের দোলাচলে ফেলে দিয়েছিল বাঙালি সচেতন বিবেককে। বাঙালির এই আত্মোপোলব্ধির সময় এক সচেতন সৈনিক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু শুরু থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো চিন্তা বাঙালির রাজনীতিতে জায়গা করে নেয়নি। সময়ের প্রয়োজন অনেক কিছুকে নিযন্ত্রণ করে। ইংরেজ সাহেব এলেন অক্টেভিয়ান হিউম যেদিন নিখিল ভারত কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন সেদিন কংগ্রেসকে কেউ সাম্প্রদায়িক সংগঠন মনে করেনি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজনীতিকদের সমাবেশ ঘটেছিল কংগ্রেসে। সন্দেহের বীজ উপ্ত হলো ১৯০৫ সালে। বঙ্গবঙ্গ ঘোষণার পর। মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ববাংলার উন্নয়নের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল বঙ্গভঙ্গ। কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদী

গোষ্ঠীর প্রবল চাপ এবং কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতা মুসলমান নেতৃত্বকে সন্দিহান করে তুলে। তাই আত্মো-অধিকারের প্রশ্নেই মুসলমান নেতৃত্বে মুসলিম লীগের জন্ম দেয়।

একইভাবে শোষণ বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগসহ বাঙালির নানা সংগঠন স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু বাঙালির ন্যায্য দাবির প্রতি কোনো সম্মান দেখায়নি পাকিস্তানি শাসক চক্র। আয়ুব খান সামরিক শাসনের যাঁতাকলে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল বাঙালির প্রতিবাদী কণ্ঠ। বঙ্গবন্ধু ততোদিনে বাঙালি নেতৃত্বের পুরোধা হয়ে উঠেছেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা তিনি। আত্মো-অধিকারের প্রশ্নে ছয়দফা নিয়ে এলেন । পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল এক অনিবার্য পরিণতি। বিপুল জনসমর্থন ছয়দফা আন্দোলনকে শাণিত করে তুললো। পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস পড়ে দেখার প্রাজ্ঞ আচরণ করতে পারলো না। দমননীতির ভুলের পথেই পা বাড়ালো। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ তার সহযোদ্ধাদের ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি নিয়ে এলো। কিন্তু ততোক্ষণে বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে গেছে। পরীক্ষিত হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব। প্রবল আন্দোলনের মুখে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো আইয়ুব সরকার। গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে ভেসে যেতে হলো আইয়ুব খানকে। এ সময় পর্যন্ত কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শাণিত হয়নি। তাই ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এ নির্বাচন দিলে এদেশের মানুষ বিপুল উৎসাহে নির্বাচনে তংশ নেয়। নিরঙ্কুশ বিজয় আসে আওয়ামী লীগের পক্ষে। তাই আওয়ামী লীগসহ বাঙালির মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্ন তখনও স্পষ্ট হয়নি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে যখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই স্বাধীকারের আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বাঙালি মানসিকভাবে পরিত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার অপেক্ষায় অস্থির প্রহর গুনে বাঙালি। ৭ মার্চে সে সময়ের রেসকোর্স ময়দানের প্রতি সবার দৃষ্টি আর মন আছড়ে পড়ে। সংগ্রামী বাঙালির মিছিল জড় হয়ে রেসকোর্স ছাড়িয়ে প্রায় পুরো ঢাকা সয়লাম হয়ে যায়। দৃঢ়চিত্ত বঙ্গবন্ধু বজ্র কঠিন অথচ কাব্যময়তার মধ্যদিয়ে তার অসাধারণ ভাষণটি দিলেন। স্বাধীনতা ঘোণার আর কি কিছু বাকি থাকে তখন। শব্দ চয়নে ছিল প্রাজ্ঞ রাজনীতিকের বিচক্ষণতা। কোনো হঠকারী সিদ্ধান্তকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। বোঝা গেছে

পাকিস্তানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধার দিন শেষ হয়ে গেছে। তবে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চাই। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। সবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা দিয়ে সকল জল্পনার অবসান করে দিলেন।

বর্তমানে দুর্নীতির দায়ে বিধ্বস্ত বিএনপির নেতৃত্ব তাদের নেতা জিয়াউর রহমানকে অপমান করে ইতিহাসের সত্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্বাধীনতার ঘোষক বানিয়েছিলেন। অথচ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলায় সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান স্মৃতিচারণমূলক এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, সম্ভবত ৪ মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নেই।... আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। ...৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল মনে হলো।

এভাবে ৭ মার্চের ভাষণ সকল পক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ম্যাসেজ পৌছে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় প্রশাসন চলছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। এই ভাষণের পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালি। শ্রমিকরা চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে। ২৩ মার্চ পাকিস্তনের স্বাধীনতা দিবসে পূর্বপাকিস্তানের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায়-মহল্লায় যুবকরা ৭ মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

সুতরাং ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রেখে মুক্তিযুদ্ধেরই ডাক দিয়েছিলেন। তা বাঙালির মনে মর্মভেদী হয়েই প্রবেশ করেছিল। এই ভাষণের পর স্বাধীনতা ঘোষণার আর কি প্রয়োজন ছিল? এভাবে ৭ মার্চের ভাষণ বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন হয়ে রইলো।

বঙ্গবন্ধু, ৭ মার্চ এবং এই সময়

রবিউল হুসাইন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং অবশেষে স্বাধীনতার ঘটনা আমাদের মননে বিশ্বাসে চিরকাল প্রজ্জ্বলিত থাকবে। ইতিহাসের সুদূরতম পর্যায়ে এদেশের জনগোষ্ঠী স্বাধীন-সার্বভৌমত্বের খানিক স্পর্শ মাত্রও লাভ করেনি, বরং সবসময় বিদেশি শক্তিশালী-শাসকদের দ্বারা বিভিন্নকালে শাসিত হয়েছে। কেউ এখানে ভাগ্যান্বেষণে এসে চিরকালের জন্যে আবাসিত হয়েছে, কেউ লুণ্ঠন শেষে আপন বাসে ফেরত গেছে। সব জেনে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, এদেশ বিদেশিদের জন্য শোষণের একটি আদর্শ উৎসস্থল হিসেবে আমাদের দুর্বলতার সুযোগে সেইসময় ব্যবহৃত ও বিবেচিত হযেছে। এই প্রেক্ষিতে হাজার বছর পর এদেশের স্বাধীনতা অর্জন সামন্তযুগে নয়, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় যামে একটি বিশাল ঘটনা। এবং এই গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে যে-যে ঘটনা বা যারা যারা জড়িত, ব্যক্তি বা দেশ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে—সবকিছুই আমাদের বোধে ও চেতনায় অতি যত্নের সঙ্গে গচ্ছিত রাখতে হবে। এসবই আমাদের দেশের অতি-উজ্জ্বল বৈদূর্য-মণিময় গৌরবচিহ্নজাত অতি আনন্দময় ইতিহাস। এসব আমাদের চিরকালের বী এবং অহংকার। এই বোধ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ নিজেদেরকে নিজেদের গর্ব অপমানিত করা, দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও মন-মানুষদের অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হওয়া। আজ স্বাধীনতার এই দিনে অনেক দুঃখ ও অনুতাপের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করি এই গৌরবময় ইতিহাসের পরম্পরা এবং ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করার হীন এক সাজানো চক্রান্ত। ইতিহাসের গণনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর যোগ্যতম স্থানে এই কীটদুষ্ট কাল স্থাপিত করতে চায় না। যে-রণধ্বনি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছিলো সেই 'জয়বাংলা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে মানুষের জিহ্বা ও কণ্ঠ ব্যবহৃত হয় না। কেউ কেউ, কী নিদারুণ স্পর্ধা, পবিত্র জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতকে পর্যন্ত অবমাননা করার দুঃসাহস দেখায়। ইতিহাসের অনিবার্যতা যারা অস্বীকার করার পরিক্রমায়

নেমকহারামি করে যাচ্ছে অবলীলায় তারা আবার এই দেশে রাজনীতি করে, সংসদ সদস্য হওয়ার দ্বিমুখীত্ব হীনতাচক্রে অংশ নিয়ে থাকে। এদেশের আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; খাওয়া-শোয়া—সবই করে যাচ্ছে, অথচ এদেশের স্বাভাবিক ও অবধারিত পরম্পরাকে স্বীকার করে না। অদ্ভুত এবং বিচিত্র এই অসততা ও অনীতিবোধ। একশ্রেণীর দেশবাসীদের মনোমধ্যে একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও ইতিহাসবোধের বেলায় যদি এইরকম ঊনতা পরিলক্ষিত হয় তাহলে সেই দেশের কিভাবে উন্নতি আর অগ্রসরতা ঘটবে। এ কারণে দেশের কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক ও সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়ে চলেছে এবং তাই এই দেশটিকে খুব দুঃখ নিয়ে একটি প্রতিবন্ধী দেশ বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হই। সাম্প্রতিক এই দুঃখময় ভাবনার নীলবিষে আজ আমাদের অন্তর বিপর্যস্ত।

তবে আশার কথা, কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ইতিহাস চলে না। ইতিহাস নদীর মতো আপন মনে বয়ে যায়, বাজপাখির মতো অবধারিত নির্দিষ্টতায় ও প্রাকৃতিকতায় সত্যকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, বিষফোঁড়ার মতো সত্য একদিন ছিঁড়ে-ফুঁড়ে-ঠেলে উঠে আসে বেদনায়-স্বস্তিতে। এই স্বাভাবিকতাই আমাদের বিশ্বাস, ভরসা এবং যথার্থ বরাভয়।

যে কোনো জাতির কতকগুলো অর্জিত সূচকচিহ্ন থাকে যা সর্বদা উজ্জ্বল উৎসের সন্ধান দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য থেকে সেইসব চিহ্নমালা পরিচিহ্নিত হয়ে থাকে, তা ব্যক্তিই হোক কিংবা ঘটনাবলিই হোক। আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সময়েও ওইসব চিহ্নাবলি অর্জিত হয়েছে এবং সেগুলোকে সঙ্কটে-বেদনায় সবার দ্বারা সবসময় আঁকড়ে ধরে থাকা প্রয়োজন। তা না হলে কিসের ভিত্তিতে এবং কোন মনোবলে দেশের সত্তা অটুট থাকবে। সেই ন্যূনতম সূচক চিহ্নগুলোকে প্রতিটি দেশবাসীকে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-গোষ্ঠী-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-দলবল নির্বিশেষে মনেপ্রাণে অবশ্য মান্য করা দরকার। একটি দেশের মধ্যে বাস করি অথচ এর ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা এবং নির্দিষ্ট উপাদানকে স্বীকার করবো না, তা তো হয় না। তা হলে তো সেই দেশের অস্তিত্বই থাকে না। এইখানে একটি যথার্থ প্রশ্ন আসে এবং সেটি হচ্ছে এই যে, এই বৈরী বোধ কেন একটি দেশের জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হলো। কারা দায়ী এর জন্যে। ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেই ভুল-ভ্রান্তি খুঁজে বের করা দরকার এবং যারা এর জন্য দায়ী তাদেরও ইতিহাসের স্বচ্ছতা প্রমাণিত করার খাতিরে বর্তমান ও নতুন প্রজন্মকে এর ফলাফল জানানোর দায়িত্ব নেয়া প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে কেউ কোনোদিন আবার ভুল পথে চলতে না পারে। অবশ্যই তদানিন্তন শাসকগোষ্ঠীকে সত্যের খাতিরে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করা আজ সময়ের ডাকে

আশু প্রয়োজন। যদি ভুল হয়ে থাকে তবে তা স্বীকার করে তাদের মহত্ব প্রমাণ করা দরকার যাতে এটি একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে দেশবাসীর কাছে। তারা তখন দেশবাসীকে সঠিকপথে পরিচালিত করে একটি সুনির্দিষ্ট দেশপ্রেম এবং দর্শনে চালিত করতে পারেননি এইটি স্বীকার করলেই বরং তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায় ও বুঝতে পারা যায় যে, তারা এই বিষয়ে সচেতন ও সজাগ। এই বিষয়ে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর কারো দ্বিধান্বিত প্রশ্ন থাকবে না। তবে এটাও ঠিক যে তদানিন্তন শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিপদ শক্তি সমূহের ইতিহাস-বিরুদ্ধতার এমন আচরণও অচিন্ত্যনীয়। কিভাবে এবং কেন তারা দেশের প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে এমন আত্মঘাতী আচরণ করেন। এসব করে তারা যে ফায়দা অর্জন করতে চান, তা হয়ে ওঠে ক্ষণস্থায়ী যা কোনোদিন বৃহত্তর কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারে না এবং তা বুমেরাং হয়ে আবারো সেই যথাস্থানে ফিরে আসে, একথা প্রমাণিত হয়েছে। এইজন্য তাদেরও নতুনভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। একটি দেশে শুধু একটি মতবাদ বা দল থাকবে তা তো কারো কাম্য হতে পারে না। অবশ্যই শাসকগোষ্ঠীর বিপরীতে একটি বা ততোধিক শক্তিশালী বিরোধী দল থাকবে এবং তা সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্যে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। তবে তা হতে হবে অবশ্যই দেশের ইতিহাস, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা অনুসারী। এইটিই একটি দেশের জন্যে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা কিছু কিছু মানুষের জন্যে একধরনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা ঘোষণার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তার রাজনৈতিক জীবনের চূড়ান্তবিন্দু প্রকৃতপক্ষে সেই দিনই। তার কর্মময় সঙ্কটাকীর্ণ আপসহীন অসমসাহসী রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে নির্মিত অন্তর্দৃষ্টির কারণে ওইরকম একটি সুদূরপ্রসারী তেজোদীপ্ত এবং কৌশলগত ভাষণ দেয়া সম্ভবপর হয়েছিলো।

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু কোনো বিদ্রোহ করতে চাননি। তিনি বিদ্রোহী বা বিপ্লবী ছিলেন না যাতে করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চার এক নিবেদিত প্রাণ অনুসারী। সেই ১৯৪৭ সালের আগে থেকে ধাপে ধাপে ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও সর্বশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তি- সর্বক্ষেত্রে শীর্ষবিন্দুর শীর্ষব্যক্তিত্ব হিসেবে অমোঘ সময় প্রবাহই তাকে নির্বাচিত করেছিলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ইতিহাসের

এমনই নিরপেক্ষ শক্তি। এসব থেকে কারো দ্বারা বিচ্যুতি ঘটানো অসম্ভব। দেশের আপামর জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক পথপরিক্রমায় বিভিন্ন জননেতার অবদান বঙ্গবন্ধুর সেই বেগমান রাজনৈতিক স্রোতকে আরো পরিপুষ্ট করে তুলে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে মাত্র, যেখানে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপরিহার্য এবং বিশ্বস্ত। সেই আসনের কেউ কোনোদিন বিকল্প হতে পারে না— এই কথাটি সবারই স্বীকার করা ইতিহাসের খাতিরেই আজ বড্ড প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি এমনই একটি প্রকৃতিনির্ভর দেববাণীসুলভ ভাষণ যেটির দ্বারা তদানিন্তন পাকিস্তানি শাসকবর্গও তাদের বিরুদ্ধে তেমন অনিষ্টকর কিছু খুঁজে পায়নি। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদের ডাক দেননি। গণতান্ত্রিক উপায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তিনি শুধু সংগ্রামের এবং স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছেন। এটিই তার রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কৌশল ও প্রজ্ঞা যার দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিলো। এটি না করে তিনি যদি সরাসরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ডাক দিতেন তাহলে তার রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি হতো বলে ধারণা করি এবং পাকিস্তানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি একটি সুদূরতম প্রয়াস হিসেবে পরিগণিত হতো। এই দূরদর্শী নানান চাপের মুখে স্থির ও অবিচল ভাষণের অন্তর্নিহিত বাণী যেমন জনগণের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো, তেমনি পাকিস্তানি প্রতিপক্ষও তাদের হঠকারী সিদ্ধান্ত যা এতোদিন ধরে আমাদের দেশের ওপর একে একে চাপিয়ে যাচ্ছিলো তার শেষ চেষ্টা বলবৎ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো এবং এইভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। সেইদিন ৭ মার্চে যদি সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদের ডাক দিতেন, তাহলে তিনি গণতান্ত্রিক গণনেতা না হয়ে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী-নেতা হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিগণিত হতেন। পাকিস্তানিদের পক্ষে খুব সঙ্গত কারণেই তখন বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ওপর নির্বিশেষে বোমা বর্ষণের মতো ঘটনা ৭ মার্চের রেসকোর্সের জনসভায় অংশগ্রহণকারী আপামর লক্ষ লক্ষ জনগণের ওপর যে পুনরাবৃত্তি ঘটতো না, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ ছাড়া এদেশ হচ্ছে সমতল ভূমি, বনজঙ্গল বা পাহাড়-পর্বত ঘেরা নয় যে দীর্ঘদিনের জন্যে গেরিলাযুদ্ধ করে সুবিধা পাওয়া যেতো। এ সমস্ত কারণে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি এমনই এক নিজগুণে ভাস্বর এবং উজ্জ্বল যে যুদ্ধ শুরুর পর তিনি সহজেই চীন ও আমেরিকার সমর্থন ছাড়াই আন্তর্জাতিক সহানুভূমি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তিনি যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার কট্টর অনুসারি ছিলেন, এ কারণে তার পক্ষে এইরূপ সুদূরপ্রসারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়া সম্ভবপর হয়েছিলো। সম্ভবত

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্গবন্ধুর মতো অন্যকোনো দেশের অন্যকোনো জননেতা এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে কোনো দেশের স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দান করেননি। এইজন্যে তাঁকে আন্তর্জাতিকভাবে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এবং এই জন্যে তাকে বাঙালি জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়, যার নীতি ও কৌশলে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সূর্য এই পোড়া ও অবহেলিত দেশে যুগযুগ পর উদিত হয়। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়াতে দেশের সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন কেউ শারীরিকভাবে, কেউ মানসিকভাবে। তবে তা উভয়ত সদা-সর্বদা সরাসরি ছিল। তা না হলে তাঁর একার পক্ষে এটি করা সম্ভবপর ছিল না যা কখনো হয় না এবং পারা যায় না। খুব কম সংখ্যক মানুষ এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিলো। তা না হলে এই জনযুদ্ধ কখনো সফলকাম হতো না। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেল, এককোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিল, ৩০ লাখ আত্মাহুতি দিল, ৩ লাখ মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারালেন। কোটি কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি , রাস্তা-ঘাট-সেতু -বাড়িঘর-দালানকোঠা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো- এসবের প্রেক্ষিতে ভারত এবং রাশিয়ার সরাসরি যুদ্ধাস্ত্রসহ সৈন্য ও তাদের জাতিসংঘে অকুণ্ঠ নিঃস্বার্থ আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন, মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা এবং যাবতীয় সাহায্য এবং সর্বোপরি এদেশের মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধাদের বীরোচিত ভূমিকার মাধ্যমে এই দেশ বাংলাদেশ নামে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এখন এদের মধ্যে অর্থাৎ যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কায়দা আর ফায়দা লুটবার জন্যে কেউ কেউ যদি উচ্চাভিলাষী হয়ে ইতিহাসের চাকা অন্যদিকে ঘুরাতে চান, তাহলে সেটা দেশের জন্যে, তেমনি তাদের নিজেদের জন্যেই, অমঙ্গল হয়ে দেখা দেবে, হয়তো এতে সাময়িক প্রাপ্তি ও লাভ ঘটতে পারে, কিন্তু কখনো তা স্থায়ী হবার নয়। তদানীন্তন সময়ে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এবং সেটি জনগণের কাছে প্রাণসঞ্চারী হয়ে দেখা দিয়েছিলো, খুব ভালো কথা, কিন্তু তাই বলে বঙ্গবন্ধু যাঁর জন্যে এই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে উপস্থাপিত হলো, তাঁর সঙ্গে, প্রতিপক্ষে বা বিপরীতে কিংবা পাশাপাশি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে দাঁড় করানো—এ কী ধরনের হীনতম প্রয়াস। এসবে কী তাদের রাজনীতি কালের বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এবং আশঙ্কা সৃষ্টির মুখোমুখি হচ্ছে না। এবং এসবে তো তাদের প্রতিপক্ষই দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে—এসব কী

তারা ভেবে দেখছেন না। তাহলে বলা যায়, মেজর জিয়ার চেয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকির অবদান আরো উজ্জ্বল, যেহেতু তিনি জিয়ার মতো একজন সামরিক বাহিনীর সদস্য না হয়ে সম্পূর্ণরূপে একজন অসামরিক ব্যক্তি হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ কর্মকাণ্ড করে মানুষের মনে তার চেয়েও বেশি উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন, তাই বলে কি কাদের সিদ্দিকীকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ ভাবতে হবে? এইসব দেখে মনে হয় সেইদিন বেশি দূরে নয় যেদিন এইরকম মানসিকতার ছিন্ন-উৎসের মানুষেরা হয়তো একদিন হঠাৎ করে ইন্দিরা গান্ধীকে কেন্দ্র করে একটি নতুন রাজনৈতিক দল করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এইসব কারণে স্বাধীনতার এই দিনে প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনকে ন্যূনতম জাতীয় দিকনির্দেশনায় এক হতে হবে দেশের সার্বিক উন্নতির খাতিরে। সেগুলো মাত্র চারটি জাতীয় বিষয়। (১) বঙ্গবন্ধুকে দেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকার করা, যদিও নৃশংসভাবে আমরা এই অকৃতজ্ঞ বাঙালিরা পরিবার-পরিজনসহ তাঁকে হত্যা করেছি সেই দায়ভারকে স্বীকার করে তার স্বীকৃতিতে কিছুটা এর লাঘব হতে পারে (২) এদেশের জাতীয় পতাকাকে পবিত্র জ্ঞান করে মান্য করা (৩) এদেশের জাতীয় সঙ্গীতকে মনেপ্রাণে অনুধাবন করা এবং (৪) এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও জনগণকে নিজের মনে করা এবং আমরা জাতিতে বাঙালি আর নাগরিকত্বকে বাংলাদেশী এই সাধারণ ও সত্যিকার যুক্তিকে মেনে নেয়া। এই চারটি ন্যূনতম জাতীয় বিষয় মেনে নিয়ে যদি যে-কোনো রাজনৈতিক দল তাদের রাজনীতির চর্চা করে যায়, তা হলে এদেশ অহেতুক ইতিহাসের ধূম্রজাল সৃষ্টির এই পতিত সময়ে এক নতুন আলোর দিক-নির্দেশনা পেয়ে ভবিষ্যতের দিকে দিনদিন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। এইসব মেনে নিয়েও বিরোধীদল করা যায় এবং তা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করি। আর যারা প্রকৃত ইতিহাস জেনেও না জানার ভান করে অসুস্থ রাজনীতির সাহায্যে সেটিকে অন্যদিকে ঘোরানোর অপচেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি আব্দুল হাকিমের কবিতা একটু বদলিয়ে বলতে চাই এইভাবে—

যে-সব বঙ্গেত জন্মি না মানে ইতিহাস
সে-সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন আভাস
দেশি কৃষ্টি-সংস্কৃতি যার মন ন জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন তারা বিদেশ ন যায়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ও বঙ্গবন্ধু

কে এম সোবহান

যারা মনে করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি আকস্মিক ঘটনা এবং কোনো একজনের ঘোষণার ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং ঘোষণার কারণেই মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তা হলে তা হবে ঐতিহাসিক ঘটনার অস্বীকৃতি। এই অস্বীকৃতির পিছনে একটি সচেতন মন কাজ করছে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে। উদ্দেশ্য একটাই ইতিহাস অস্বীকার করে একজনকে সামনে আনা—যার অতীত জীবন কেটেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে এবং সম্ভবত বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই কথাগুলো আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশের সংবিধানের '৭৫-পূর্ব প্রস্তাবনার সঙ্গে ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২য় তফসিল বলে সন্নিবেশিত অংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

'৭৮ এর সংবিধান সংশোধনের পূর্বে প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয় আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি

এই অনুচ্ছেদটি '৭৮-এ সংশোধনের পর বলা হলো, আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

এই সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে কথাগুলো পরিবর্তন করে বলা হলো জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে।

এখানে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম কথাগুলো বাদ দিয়ে '৪৭-এর আগস্ট মাস থেকেই অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টি প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের গণমানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম

করেছে নিরলসভাবে যে আত্মত্যাগ করেছে, যে আন্দোলন করেছে সব কিছুকে অস্বীকার করা হয়েছে। '৪৭-এ বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ৪৮ ও '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে দ্বিজাতি-তত্ত্বের বাহক মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়, '৫৬-র সংবিধানে পূর্ববাংলা শব্দের পরিবর্তে পূর্বপাকিস্তান লেখার প্রতিবাদ হিসেবে গণপরিষদে আওয়ামী লীগ সদস্যদের সংবিধানে স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃতি '৬২ ও '৬৪ তে ছাত্রদের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে রক্তদান, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান '৭০-এর নির্বাচনে ১লা মার্চ থেকে ২৫ মার্চ অর্থাৎ গণহত্যার আগে পর্যন্ত জনগণ যে রক্তাক্ত আন্দোলন করছিল যাতে এক লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবননাশ হয়েছিল (পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দপ্তর, পাকিস্তান সরকার ৫ আগস্ট ১৯৭১) তাকে অস্বীকার করা হলো। এই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে সিদ্দিক সালেকের 'উটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায়। এই শ্বেতপত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান সরকার প্রকাশ করেছিল।

সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম-এর পরিবর্তে '৭৮-এর সংশোধনে বলা হচ্ছে যে, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে বলা হয়েছে। এই পরিবর্তন সাধন করেন জে. জিয়া, তার মুক্তি সংগ্রামে কোনো ভূমিকা না থাকার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করার জন্য। '৭০-এর নির্বাচনকে বঙ্গবন্ধু তার ছয় দফার রেফারেন্ডাম বলে প্রচার চালিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে রায় চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন। এই নির্বাচনের ফলে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে যায়। এর ফলে সংবিধান তৈরির জন্য যে সংসদ অধিবেশন ঢাকায় ৩ তারিখ ডাকা হয় তা জে. ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে স্থগিত করে দেন। এই ঘোষণার সাথে সাথেই সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ মিছিল করা হয় ১ মার্চেই। ১ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত যেসব ঘটনা এই অঞ্চলে ঘটলো তাতে এদেশে পাকিস্তান সরকারের শাসনকে অস্বীকার করা হলো। পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হলো এবং বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে তার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা দেবেন বলে জানালেন।

৭ মার্চে রেসকোর্সের ময়দানে দশ লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা দিলেন আর বাংলাদেশের জন্যে বাঙালি জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। তার বক্তৃতা রেসকোর্স ময়দান থেকে রেডিও

পাকিস্তান কর্তৃক সরাসরি প্রচারের কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার তা করতে দেয়নি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারকে ৮ মার্চ থেকে কী করতে হবে এবং হবে না তার নির্দেশ দিলেন এবং বাংলার মানুষকে পূর্বপাকিস্তান সরকারকে কী করতে হবে তাও বললেন। তিনি বললেন, কোনো ট্যাক্স আদায় করা চলবে না। বাংলাদেশের সমস্ত সরকারী বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতসমূহ হরতাল চালিয়ে যাবে। এভাবে তিনি ১০টি করণীয় কর্তব্য জানালেন। সর্বশেষে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এর আগে তিনি জনগণকে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন।

৮ মার্চ থেকে ওই নির্দেশ মতো কাজ চলতে থাকে। অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশের ডিফ্যাক্টো প্রধানমন্ত্রী হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ সরকার তার আদেশেই কাজ করতে থাকেন।

৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে তাকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধের কথাও বলা হয়েছে। এই ভাষণই প্রকৃতপক্ষে ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ভাষণ। এখানে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় তার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে এবং কিভাবে ধাপে ধাপে এই সংগ্রাম এগিয়েছে তাও বলেছেন। সংবিধানে যে চারটি মূলমন্ত্র রাখা হয়েছিল তার কথাও এই ভাষণে ছিল। তিনি বললেন এই বাংলার হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আছে এর মধ্যে জাতীয়তাবাদের কথা আছে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। তিনি বলেছেন, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তিনি এই ভাষণে পূর্বপাকিস্তান বা পূর্ববাংলা শব্দটি ব্যবহার করেননি তিনি পরিষ্কার বলেছেন, বাংলাদেশ-এর কথা অর্থাৎ পাকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তান-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো এই ভাষণে। এতেই ঘোষণা দেয়া হলো একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে যার ভৌগোলিক সীমার পূর্ববর্তী নাম ছিল পূর্বপাকিস্তান, তাকে স্বাধীন করে বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়ের জন্য যুদ্ধের ডাক দিলেন বাঙালিকে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। এই ধারাবাহিকতায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ, ১৯৭১-এ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বাংলাদেশের আক্রমণ করার সাথে সাথেই।

সাত মার্চ : অবিনাশী কথামালার জন্মদিন

যতীন সরকার

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে—কবি জীবনানন্দ দাশের জননী কুসুম কুমারীর একটি কবিতার এই ছত্র দুটোকে ছেলেবেলাতেই আমাদের মনে গেঁথে দেয়া হয়েছিল। বাঙালিরা যে কথা বলতেই পটু, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—এমন কথাকেও আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। কথার বদলে আমাদের সবাইকেই কাজরে মানুষ হয়ে উঠতে হবে-এমন অনুজ্ঞারও আমরা বিরোধিতা করিনি।

কিন্তু পরিণত বয়সে আমার মনে হয়েছে যে কথা ও কাজের এ রকম জল-অচল বিভাজন করে দেয়া মোটেই ঠিক নয়। অন্তত কথার কথা ও কাজের কথার পার্থক্যটি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতেই হবে। কথার কথা জলবুদ্ধুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু কাজের কথা বর্তমানকে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার বিভা ছড়িয়ে যেতে থাকে।

কথার কথা বলা হয় নিতান্তই অভ্যাসের বশে, এর পেছনে কোন সচেতন ভাবনা বা দায়িত্ববোধ থাকে না। এ রকম কথাসর্বস্ব মানুষ যারা, তাদেরকেই বলে বাচাল। বাচালরা সবারই ধিক্কারের পাত্র। কবি কুসুম কুমারীও কথায় বড় বাচালদের ধিক্কার জানিয়ে একান্ত মনে কামনা করেছেন যে, দেশে কাজে বড় মানুষ বা কাজের মানুষদের আবির্ভাব ঘটুক।

কিন্তু যাদের মুখে কথা নেই তারাই হলো কাজের মানুষ—এমন কথাও মোটেই ঠিক নয়। বাচালরাও যেমন ধিক্কারের পাত্র, তেমনই সবসময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে যে মানুষ সে মানুষও প্রশংসায় ভূষিত হতে পারে না। কাজ করতে হলে তো অবশ্যই চিন্তা করতে হয় এবং সেই মূর্তিহীন চিন্তাই কথার মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, কথার সেই মূর্তিগুলোই প্রাণ পায় কাজের মধ্যে। কথার আধারে কাজের লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌছার পরিকল্পনাকে সূত্রবদ্ধ করে না নিয়ে সত্যিকার কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। কথা আসে চিন্তা থেকে, কথার

আধারেই চিন্তা আশ্রয় নেয়, সেই চিন্তাই কথা হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তখন সেই কথাকেই রূপ দিতে হয় কাজে। এরকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়ে কোনো ব্যক্তিই কাজের মানুষ হতে পারে না। এ কথাটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই সত্য সমষ্টি তথা যে কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও। জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই বরং কথাটি অনেক বেশি সত্য। অনেক অনেক ব্যক্তির সমবায়েই তো গড়ে ওঠে একেকটি জনগোষ্ঠী। পৃথক পৃথক ব্যক্তির ভাব-ভাবনাগুলো সম্মিলিত হয়েই পরিণত হয় সমষ্টিবদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভাবনায়। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভাবনাতেই থাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আকুল আকুতি। সেই আকুতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত রূপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। গোষ্ঠীর সেই আকুতিটি সুনির্দিষ্ট ও সংহত কথার মধ্যে রূপ পেতে চায়। কিন্তু সেই চাওয়াটি খুব সহজে পাওয়ায় পরিণত হয় না। সেই কাঙ্ক্ষিত কলাটির জন্ম হওয়ার জন্য শত শত বছরও লেগে যেতে পারে। তারপর কোনো এক শুভ দিনে গণমনে যুগ যুগ লালিত সেই আকুতিটি অস্ফুট ভাবনার নির্মোক ভেঙে পরিস্ফুট ভাষা হয়ে বেরিয়ে আসে, জন্ম নেয় অসীম শক্তিধর অবিনাশী এককথা বা কথামালা। সমগ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর মথিত সেই কথা বা কথামালা নিঃসৃত হয় যার মুখ থেকে, তিনি শুধু তখন একজন কথাকার হয়ে থাকেন না, হয়ে ওঠেন সেই জনগোষ্ঠীর পরিত্রাতা ও ভয়ত্রাতা।

এরকমটি হয়তো সর্বত্রই ঘটে, তবে সর্বত্র একইভাবে ঘটে না। অন্তত বাংলাদেশে যেভাবে ঘটেছে, এমনভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে জনগণ কাঙ্ক্ষিত কথামালার জন্ম বোধহয় কোনো দেশেই ঘটেনি, কোনো দেশের মানুষেরই সম্ভবত এমন কথামালার জন্মদিন পালনের সৌভাগ্য হয়নি। এদেশের মানুষের বহুযুগ লালিত বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষাটি মূর্ত কথামালা হয়ে জন্ম নিয়েছে যে বিশেষ দিনে, সে দিনটিই সাতই মার্চ। বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট একটি দিন—একটি অসাধারণ কথামালার জন্মদিন। কথামালার এই জন্মদিনটি যেমন অবিস্মরণীয় তেমনই অবিস্মরণীয় এই কথামালার জন্মদাতা শেখ মুজিবুর রহমান। বঞ্চিত বঙ্গজনের পবিত্রতা ও ভয়ত্রাতা রূপই যিনি বঙ্গবন্ধু।

হাজার বছর ধরে এদেশের লোক সাধারণ স্বাধিকার বঞ্চিত হয়ে থেকেছে, নানাধরনের অধীনতার বাঁধন তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সেই বঞ্চনা থেকে, বাঁধন থেকে মুক্তির স্পৃহা তাদের ভেতরে গুমড়ে গুমড়ে মরেছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তির পথ তারা খুঁজে পায়নি। তা বলে খোঁজার প্রয়াস থেকে তারা বিরতও

থাকেনি। তাদের অবিরাম প্রয়াসে অনেক রক্ত ঝরেছে, সে প্রয়াস অনেক খণ্ড খণ্ড সার্থকতারও জন্ম দিয়েছে, কিন্তু সার্থকতার শীর্ষবিন্দুটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তাদের চাওয়ার বিষয়টিও নিজেদের কাছে ছিল একান্ত ধোয়াটে; তাদের ভাবনা ছিল, কিন্তু সেই ভাবনা তাদের চিত্তলোকে কোনো মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেনি; তাদের বিমূর্ত বিক্ষিপ্ত ভাবনা বা চিন্তা সুনির্দিষ্ট কথামালায় মূর্ত ও সংহত হয়ে উঠতে পারেনি। আবহমান বাংলার লোক সাধারণের এ রকম ভাবনাই সব অস্পষ্টতা ও অমূর্ততার কুয়াশা ভেদ করে একাত্তরের সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে জন্ম নিল চির কাঙ্ক্ষিত ও সংহত কথামালা। সে কথামালর প্রাণজীবকে ধারণ করে এর শেষ বাক্যগুলো—

রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব/এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

হ্যাঁ, অবশ্যই শেখ মুজিবের মতো বিশেষ একজন মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত ছিল এই কথামালা। তবু কিন্তু এই কথামালা কোনো ব্যক্তি মুজিবের নয়, সব মুক্তিকামী বঙ্গজনের। অতীতের হাজার বছরের অগণিত বঙ্গজনের অমূর্ত ভাবনাই মূর্ত ভাষার রূপ ধারণ করে এই কথামালার সেদিন জন্ম হয়েছিল। তাই দেখি মুজিবের যারা কট্টর বিরোধী বা কঠোর সমালোচক ছিলেন, অথচ অন্তর-গভীরে লালন করতেন মুক্তির আকুতি, তারাও সেদিন মুজিবের বজ্রকণ্ঠের আহ্বানেই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে প্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা যাদের কাম্য ছিল না, সেই স্বদেশদ্রোহী স্বজাতিবিদ্বেষী কুলাঙ্গাররাও সেদিন এই আহ্বানের প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। এমনকি সেদিনকার পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোও অনেক নরম সুরে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল। মুজিব কথিত মুক্তির সংগ্রাম-এর সোজাসুজি বিরোধিতা না করে পূর্বপাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমও সেদিন ধূর্ত উদারতার (!) সঙ্গে অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এভাবেই বর্তমান সংকট থেকে জাতির উত্তরণ ঘটতে পারে।

আসলে জাতির উত্তরণ নয়, মুক্তিসংগ্রামীদের রোষের হাত থেকে নিজেদের চামড়া বাঁচানোই তখন অনেকের জন্য আশু প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ তারা দেখতে পেরেছিল যে সাতই মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যা উচ্চারিত

হয়েছে তা মোটেই 'কথার কথা' নয়, জাতির হৃদয়-নিংড়ানো 'কাজের কথা' এবং এই কাজের কথার মাধ্যমে পুরো দেশের মানুষই কথায় না বড় হয়ে কবি-কাঙ্ক্ষিত কাজে বড় হয়ে উঠেছে। সেই মানুষেরা বুঝে ফেলেছে যে, কেউ তাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। তাই যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে তারা শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাদের সবার জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাব-নাহীন হয়ে গেছে। কবি নির্মলেন্দু গুণ যে সাতই মার্চের কথামালাকে কবিতা ও তার কথাকারকে কবি আখ্যা দিয়েছেন তাতে একটুও অতিকথন নেই। কবিতা ও কবি সম্পর্কে যেসব গতানুগতিক ধারণা পোষণে আমরা অভ্যস্ত, সেসব ধারণার মানদণ্ডে সাতই মার্চের কবিতা ও কবির মূল্যায়ন মোটেই সম্ভব নয়। অভ্যস্ত ধারণার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ওই কবিতাটির অসাধারণত্ব কোনো মতেই শনাক্ত করা যাবে না, চেনা যাবে না এর কবিকেও।

তবে একাত্তরে বঙ্গজনদের মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেয়ার লক্ষ্যে শত্রুর পদলেহী কুকুরের মতো আচরণ করেছিল যেসব জাতিদ্রোহী কুলাঙ্গার, তারা সাতই মার্চের কবিতাটির মর্মবাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারণ ওই জ্ঞানপাপীরা তো পরাজিত হয়েছিল এই কবিতাটির অসীম শক্তিতে শক্তিমান মুক্তিসংগ্রামীদের হাতেই। তাই পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে জ্ঞানপাপীরা আজ তাদের সব আক্রোশ ঢেলে দিচ্ছে ওই কবিতা ও তার কবির ওপর। ওরা ইতিহাস-বিকৃতির উপকরণ সংগ্রহ করছে কবিতাটির বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষা থেকে এবং সেই বিকৃত ব্যাখ্যা-ভাষা দিয়েই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কবির চরিত্র হননের। নানাভাবে মানুষকে ওরা বোঝাতে চাইছে : শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কোন কথাই ছিল না, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন ছাব্বিশে মার্চে জিয়াউর রহমান, শেখ মুজিব পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি...।

অথচ সবাই জানেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক জিয়াউর রহমান নিজেই একটি প্রবন্ধে (একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ ১৯৭২ এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২) লিখেছিলেন—

সাতই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠেছিল।

সাতই মার্চের সেই কথামালায় অনেক স্পষ্ট কথা যেমন ছিল তেমনই এমন অনেক ইঙ্গিত ছিল যা স্পষ্ট কথার চেয়েও অনেক বেশি ব্যঞ্জনাবহ। ওইসব

ব্যঞ্জনাই ওই কথামালাটিকে অবিস্মরণীয় কবিতায় পরিণত করেছিল। এ যেন কথাকে অর্থের বন্ধন হতে ভাবের স্বাধীন লোকে পৌঁছিয়ে দেয়া। কবিতার এরকম ব্যঞ্জনাময় রাজনৈতিক কৌশলের কাছে সেদিন চূড়ান্ত মার খেয়েছিল পাকিস্তানি জেনারেলদের রণকৌশল। ১৯৭২ সালে মার্কিন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু তো স্পষ্ট করেই বলেছিলেন—

৭ মার্চ যখন আমি ঢাকা রেসকোর্স মাঠে আমার শেষ মিটিং করি ওই মিটিংয়ে উপস্থিত দশ লাখ লোক দাঁড়িয়ে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানকে স্যালুট জানায় এবং ওই সময়ই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়ে যায়। ...

আমি চেয়েছিলাম, তারাই (অর্থাৎ পাকিস্তানি, সেনাবাহিনী) প্রথম আমাদের আঘাত করুক। আমার জনগণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত। তবু সব কিছুর পরও, জ্ঞানপাপীদের বাচালতা থাকবে না। এসব বাচালতায় কান না দিলেও আমাদের চলবে।

তবে আশঙ্কার কথাটা হচ্ছে, আমরা নিজেরাও এখন আর আগের মতো নেই। সাতই মার্চের কথামালা নিয়ে আমরা কেবলই কথার বুদ্বুদ সৃষ্টি করে চলছি, সেই কথামালার প্রাণশক্তিকে অন্তরে ধারণ করছি না, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি না। আমরা ভুলে গেছি যে স্বাধীনতার সংগ্রাম-এ জয় লাভ করেও মুক্তির সংগ্রাম-এ জয় আমাদের অনায়ত্তই থেকে গেছে।

সাতই মার্চে সেই অসীম শক্তিধর অবিনাশী কথামালার জন্মদিনটি হোক আমাদের অপহৃত জয়কে ফিরিয়ে আনার এবং কাঙ্ক্ষিত মুক্তির সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগ করার বজ্র শপথ গ্রহণের দিন।

সাত মার্চ দিচ্ছে ডাক যুদ্ধাপরাধী চক্রান্তকারী নিপাত যাক
কামাল লোহানী

শিক্ষাবিদ, লেখক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বললেন, কী কথা কয় মুক্তিযুদ্ধের ৭ মার্চ? আমার তখন মনে হচ্ছিলো, ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে যে কথা বলছিল, আজ নতুন শতাব্দীর ঊষালগ্নে বলছে কি তাই? বাংলার মানুষ সবাই বোধহয় একসঙ্গে? বলবেন, না সেদিনের কথা বলছে না। কিন্তু আমরা যারা সেই প্রজন্মের এখন ৩৮ বছর পেরিয়ে গেছি, তারাও যেন ফিরে ফিরে তাকাতে চাই সেই উত্তাল ৭ মার্চের দিকে, অগ্নিগর্ভ বাংলার মার্চের দিনগুলোর দিকে। সেদিন যে কথা বলেছিল এই বাংলা, বাংলার জনগণ, লোক-লোকালয়, নগর-বন্দর, রাজপথ, আজ হয়তো সেই কথা বলবে না তবে নিশ্চয়ই বলছেন দেশবাসী আপামর জনসাধারণ আবার এসেছে ডাক নতুন করে লড়াইয়ের, এবার বলছে সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। এই মাটিতেই হবে তাদের বিচার, এ দেশের আইনেই বটে। কোনো বিদেশি আইনের সাহায্য নিতে হবে না আমাদের । যে দেশে জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ মানুষ আর তরুণ সমাজ ভোট দেয় ওদের বিচার এবং শাস্তির জন্য, যে দেশের মাটি আজো স্বজনের রক্তে ভেজা, যে মাটির জীবিত সন্তানরা আজো অঝোরে কাঁদে তার বাবা, ভাই কিংবা পুত্রের শোকে; আর বাংলার অগণিত লাজনম্র বধূ কিংবা ভগিনী অথবা মাকে লাঞ্ছিত করার অপমানে সেই কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, অর্ধশত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিবাসী লড়াকু মানুষ আবার শুনেছে নতুন ডাক এই নতুন শতাব্দীর ভোরে—ওঠো জাগো রে সবাই, কোমর বেঁধে তৈয়ার হও মাতৃভূমির মান বাঁচাতে। ধানের শীষে উঠেছে অস্ত্রের ঝনাৎকার, সে অস্ত্র উঠেছিল কৃষক মজদুরের হাতে। আজ কেবল স্বাধীনতাহীনতার চক্রান্ত । একে রুখে দিতে এবারের ৭ মার্চ দিচ্ছে ডাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। সন্ত্রাস-সংঘর্ষ বন্ধ করতেই এ নরখাদক-পিশাচদের বিচার অত্যাবশ্যক। যথাসময়ে এ বিচার সম্পন্ন হয়নি বলেই আজ দেশময় অরাজকতা ছড়াচ্ছে ওই ঘাতক চক্র

নানা কৌশলে, ভিন্ন ভিন্ন অছিলায়। তারই আরেক মর্মান্তিক পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করলাম ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহে। ওতো বিদ্রোহ ছিল না, ছিল নতুন এক ষড়যন্ত্র এবং সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের বিপুল অর্থ ব্যয় করে একেকজন সেনা অফিসার এমনকি বিডিআর সদস্যদেরও তৈরি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় সত্তরজন সেনা অফিসার জেনারেল থেকে ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হয়েছে, রাষ্ট্র, সরকার, জনগণ কি এ নিষ্ঠুর নির্মম পরিণতি সইতে পারে? তাই এবারের ৭ মার্চ ডাক দিয়েছে; রুখে দাঁড়াও গণশত্রু চক্রকে, বিচার করো যুদ্ধাপরাধীদের, শাস্তি দাও, মূল উৎপাটন করো চক্রান্তের ষড়যন্ত্রের।

আজ আবার স্মরণ করতে হবে, যারা বর্তমান জনগণের নিরঙ্কুশ রায়ে নির্বাচিত তিন-চতুর্থাংশ আসনে বিজয়ী গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সরকার ও তার কার্যক্রম সমর্থন না করে কেবল বিরোধিতাই করে যাচ্ছেন, তারা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি। বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালের পুরো সময়ই পাকিস্তানি সেনা অফিসারের তত্ত্বাবধানেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন, তিনি যখন দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও স্লোগান দিয়ে মানুষের কাছে যান, জনগণ তাকে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অসৎ সঙ্গের সোহবতের কারণে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮-এর জাতীয় নির্বাচনে গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু যে খালেদা জিয়া বাঘে রক্তের স্বাদ পাওয়ার মতো ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছেন, তার স্বাদকে অপূর্ণও রেখেছেন ভোটার সাধারণ। মাত্র ২৯টি আসন পেয়ে তেলেবেগুনে জ্বলছেন প্রতিমুহূর্তে। তাই পরিবর্তনের সবক তত্ত্বাবধায়কমণ্ডলীর কাছ থেকে নিলেও গায়ের জ্বালা মেটাতে পারছেন না।

এ দেশ এই বাংলাদেশ তো যুদ্ধাপরাধীরা চাননি। তাই তো মুক্তিযুদ্ধকালে যারা স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছিল, হত্যাযজ্ঞে মেতেছিল বাংলার কৃতী সন্তান, বরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীদের, সেই তাদের সঙ্গেই অর্থাৎ জামায়াত-শিবির, আলবদর, আলশামস, রাজাকাররা নির্মম নৃশংস নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে যাদের হত্যা করেছিল, যেন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াতে না পারে, সেই নরপিশাচ গোষ্ঠী যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তারা কোন বাংলা চায় কিংবা বাংলাকে কোন পথে টানতে চায়? যখন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মুখে কুৎসিত অশ্লীল বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েও তাকেই দলে ভেড়ায় এবং নিজের রাজনৈতিক উপদেষ্টা বানায়, তখন কোন মানসিকতার প্রকাশ ঘটে?

সেই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী যে তার দোর্দণ্ড প্রতাপের একটি নির্বাচনী এলাকায় নতুন মহাজোট প্রার্থী ড. হাছান মাহমুদের কাছে হেরে নির্লজ্জের মতো বিরোধী দলের 'উপনেতা' হয়েছেন। তাহলে পাঠক জনসমর্থন যার কমে গেছে নির্বাচকরা তাকে চায় না সেই সাকাকেই বেগম সাহেবা বেছে নিলেন কেন দলীয় উপনেতা হিসেবে? অথচ এম কে আনোয়ারের মতো একজন প্রশাসনে অভিজ্ঞ, প্রায় দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমায় পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে দুরন্ত এক প্রবীণ নেতাকে তিন নম্বরে রেখে সাকাকে কেন উপনেতা বা দুই নম্বর বানালেন সংসদে। কারণ বোধহয় 'এঁড়ে তক্ক' করতে অভ্যস্ত তিনি। তাছাড়া স্পিকার মাইক বন্ধ করে দিলেও তিনি হেঁড়ে গলায় চিৎকার করতে পারেন এবং এই বিরোধীদলীয় ভাষা প্রয়োগে কিংবা দেহভঙ্গিতে ভব্যতা মানেন না।

এ দুজন—খালেদা জিয়া, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং সেই বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক জাতীয় সংসদে এবং সংসদের বাইরে যে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেই চলেছেন, তাতে আদৌ কি জনগণের পক্ষে দেশের কোনো কল্যাণে কাজ করছেন? খালেদা জিয়া প্রথমে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করলেন বটে এবং সরকারকেও বললেন, যে কোনো সহযোগিতা প্রদানের জন্য। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কী নির্দেশ পেলেন যে, 'পাশা উল্টে গেল'। গলার রগ ফুলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা, সিদ্ধান্তহীনতা এমনকি ইচ্ছা করে আলোচনার নামে বিলম্ব কারার অভিযোগও আনলেন। ইদানীং শোক মিছিল করে বলেছেন, আলোচনার সুযোগে অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নাকি করে দিয়েছেন। ... গোটা পরিস্থিতি ভেতরে এবং বাইরে, যাচ্ছিল; সেই বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী তার প্রবীণ নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রীবর্গ এবং তিন বাহিনী প্রধানদের নিয়ে বারবার বৈঠক করেই সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেখানে এতো ক্ষোভ কেন তার? তবে কি বলা যায়, চোরের মায়ের বড় গলা? এতোদিনে কেন এসব কথা বলছেন? সরকারের ডাকের অপেক্ষায় থাকলেন কেন? বিএনপি কি এ দেশের অংশ নয়? তবে কেন প্রধানমন্ত্রীর ডাকের অপেক্ষায় থেকে নিজের দায়িত্বে এগিয়ে গিয়ে অবাঞ্ছিত সমালোচনা করে পাঁচ বছর পরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের পুঁজি জমা করছেন? এ দেশের সব মানুষ, বিদেশি রাষ্ট্রদূত যারা ঢাকায় আছেন, এমনকি বিদেশি সরকার ও সরকার প্রধানরাও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা দেশ ও জনগণের কারবালা সৃষ্টি করতে না দিয়ে যে দক্ষতা ও মেধার স্বাক্ষর রাখলেন, খালেদা যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন ক্ষমতায় যেতে পারেন, তখন এ দৃষ্টান্ত তাকেও অনুসরণ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়চেতাবোধ ও মেধাশক্তির প্রশংসা সবাই করছেন। এটা প্রশংসা পাওয়ার কোনো ব্যাপার নয়, প্রধানমন্ত্রীকে এ চরম সঙ্কট মুহূর্তে যা করা প্রয়োজন, আলোচনার মাধ্যমে তাই করছেন। আর বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া জনগণের এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বিরোধী নেত্রী সেজে বসে আছেন সরকারি দলের আমন্ত্রণের অপেক্ষায়। হায়রে বিরোধী দল! কী নির্মম পরিহাসই না করছেন দেশের এ সঙ্কটে। এতো উজ্জ্বল সেনা অফিসারের অকালমৃত্যু এবং ধিকৃত হত্যাকাণ্ডে।

শিক্ষার বিষয় আজ ৭ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে পূর্ব বাংলার সেই সময়ের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে প্রবল আস্থায় নির্ভীকচিত্তে ঘোষণা করেছিলেন—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রেসকোর্স ময়দানে উপচেপড়া লাখো মানুষের উত্তাল মিছিলের সঙ্গমস্থল ওই গণজমায়েত সেদিন গর্জে উঠেছিল।

পদ্মা মেঘনা যমুনা
তোমার আমার ঠিকানা,
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো।

তাই তো ছাত্রবন্ধু সাধনের 'বাংলার কমরেড বন্ধু এবার তুলে নাও হাতিয়ার দূরদর্শী আহ্বান বাংলার তারুণ্যকে উজ্জীবিত করেছিল। আর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর এমন ঘোষণা যেন গোটাজনসমুদ্রকে উত্তাল গর্জনে প্রবল করে তুললো, বাতাসে ছড়িয়ে গেল খবর। আমরা প্রস্তুত হলাম ঘরে ঘরে। পাড়ায় মহল্লায়, জেলায় জেলায় দেশের সবখানে গড়ে উঠলো প্রতিরোধ। কারণ সামরিক শাসনকর্তা আইয়ুব খানকে উল্টে দিয়ে ইয়াহিয়া খান যে 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' জারি করেছিল, সেসব মেনে নিয়েও আওয়ামী লীগ দেশের সর্বত্র অর্থাৎ পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ প্রায় সবটাই দখল করেছিল। আর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল কেন্দ্রীয় জাতীয় সংসদেও। জুলফিকার আলী ভুট্টো জিতেছিল পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভাবী প্রধানমন্ত্রী সম্বোধন করলেন শেখ মুজিবকে। কিন্তু ঢাকায় যে নতুন সংসদের অধিবেশন ডেকেছিলেন, তা হঠাৎ ১ মার্চ দুপুরে বেতার ভাষণের মাধ্যমে বাতিল করে দিলেন। জ্বলে উঠলো বাংলা। স্টেডিয়ামে চলছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। গ্যালারি যেন আগুনের ফোয়ারায় রূপ নিল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন পূর্বাণী হোটেলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠককে অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রস্তুতিতে। কিন্তু এ খবর যখন সব প্রত্যাশাকে শূন্যগর্ভ করে দিলো তখন সারাবাংলাই যেন উত্তপ্ত, অগ্নিগর্ভ। পূর্বাণীর পোর্চে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—আগামীকাল ২ মার্চ রাজধানীতে, ৩ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে। ৪, ৫, ৬ সবদিন ৬ থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল। কিন্তু শেখ মুজিব হুকুম দিলেন ২টা ৩০ থেকে ৪টা ৩০ পর্যন্ত অফিস খোলা থাকবে, কর্মচারীদের বেতন দিয়ে দিতে হবে। আর ব্যাংক খোলা থাকবে প্রয়োজনে টাকা তোলার জন্য। এদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গুলি চালালো এন্তার। বিভিন্ন শহরে মরছে বাংলার মানুষ। প্রতিবাদও চলছে। মিছিল হচ্ছে, হরতাল ভাঙতে সাহস করেনি।

৭ মার্চ ছুটছে মানুষ অগুনতি রমনা রেসকোর্সে। মুখে জয় বাংলার রণধ্বনি। সকাল থেকে বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে আসছেন মানুষ, হাতে বৈঠা, কাঁধে লাঙ্গল। টঙ্গী, আদমজী, ডেমরা থেকে আসছেন মেহনতি মানুষ। সবার মুখেই একটি স্লোগান, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। আমরা তো লড়েছিলাম প্রবল প্রতাপে, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর জওয়ান সবাই ছিল সেদিন কৃষক, শ্রমিক ছাত্র-জনতার সঙ্গে। আমরাই জয়ী হয়েছিলাম।...

আজ ৭ মার্চে এসেছে সেই ডাক নতুন করে, বলছে, যুদ্ধাপরাধী, সন্ত্রাসীদের হাত থেকে আমরা প্রিয় স্বদেশকে রক্ষা করবোই।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ

আবুল হাসানাত

হঠাৎ ৭ মার্চের ভাষণের জন্ম হয়নি। দীর্ঘ শোষণ ও শাসন যা পাঞ্জাবিরা তথা পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের (তদানীন্তর পূর্বপাকিস্তান) ওপর করেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ওই ভাষণ। বলা বাহুল্য, ঘটনা একদিন ঘটে, কিন্তু তার কারণগুলো বহুদিন ধরে ঘটতে থাকে। আমাদের গালে চপেটাঘাত করেছিল শাসকসমাজ ভাষার প্রশ্নে। যেখানে বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ছিল, অথচ সে দাবি আমরা করিনি- মহত্ত্ব দেখিয়ে বলেছি, বাংলা ও উর্দু দুটি ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হোক—যদিও আমরা জানি, পশ্চিম পাকিস্তানের কারোর ভাষা উর্দু নয়, তাদের ভাষা পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচি ইত্যাদি। এখন দেখা যাচ্ছে, অপরাধ করেছিলাম, বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে—এ দাবি করা উচিত ছিল কিন্তু আমরা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ও দেশের জনগণের কল্যাণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে শান্তি-ভালোবাসা ও মৈত্রীয় বন্ধন গড়তে গিয়েছিলাম। সেটাও আমাদের অপরাধ। যাহোক, প্রাণ দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা করলো বাঙালিরা। তখন থেকে বোঝা গেল, আমাদের আরো রক্ত দিতে হবে। বাঙালির কোনো ন্যায্য দাবি পাকিস্তান সরকারের মেনে না নেয়ার অহংবোধও স্বেচ্ছাচারিতা একটি বাতিক বিশেষ।

ভাষার প্রশ্ন মিটে গেল, কিন্তু সংবিধান প্রণীত হলো না। ভারতে যেখানে সংবিধান রচনা করে নির্বাচন হয়ে গেল, সেখানে পাকিস্তানে সংবিধান রচিত হলো ১৯৫৬ সালে। এবং ৫৪-তে পূর্ববাংলায় যে নির্বাচন হলো তা নীরব (ব্যালট বলা উচিত) বিপ্লব। মুসলিম লীগ বিলুপ্ত হয়ে গেল—থাকলো ভস্ম ছাই। কিন্তু ১৯৫৮-৫৯-এ নির্বাচন করে গণতন্ত্রের পথে দেশটি যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিপথগামী জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসনের মাধ্যমে দেশটির বারোটা বাজালো এবং তারই উত্তরসূরি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিলো অর্থাৎ রাজনীতিজ্ঞদের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে

নেয়ার ফলস্বরূপ পাকিস্তানই ভেঙে গেল। মাথা মোটা জেনারেলদের দ্বারা এর চেয়ে মহৎ কাজ করা কী হতে পারে।

জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭০-৭১-এ নির্বাচন দিলো। মতলব ছিল বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কলহে তিনি ফায়দা তুলবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এ অঞ্চল। আর তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছড়ি ঘোরাবেন। কিন্তু ১৯৫২-এর জাগ্রত ছাত্র-জনতা এমনভাবে নির্বাচনে ভোট দিলো যে, ইয়াহিয়ার স্বপ্ন বেলুনের মতো চুপসে গেল। বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ এককভাবে সংবিধান তৈরি ও দেশ শাসনের অধিকারী হয়ে গেল।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মতলব, ক্যু ভেস্তে গেল। তখন ঘরের শত্রু বিভীষণ (রাজনীতির ক্ষেত্রে) হয়ে গেল ভুট্টো। বাঙালির দাবি না মানার বেসামরিক ব্যক্তি। আর পীরজাদারা তো আছেই বাঙালিদের শায়েস্তা করতে। তা কিন্তু বুমেরাং হতে পারতো কী পাকিস্তানি শাসকরা ভেবেছিল! ভাবুক আর না ভাবুক, ব্যক্তির হাতে অস্ত্র থাকলে অস্ত্র ব্যবহার করাই শ্রেয় মনে করে। ভাবেনি, গণতন্ত্র মানতে হয়; নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠকে মূল্য দিতে হয়। শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো না। কিন্তু এমনই বিতৃষ্ণা যে, তাদের ভাষায় কালো কুত্তাদের বসতে দেবে না গদিতে। একবারও ভাবেনি পাঞ্জাবি আমলা কর্তৃক বেষ্টিত প্রধানমন্ত্রী বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। গণহত্যা করলে বাঙালি অস্ত্র তুলে নেবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত বাঙালিদের জায়গা দেবে, সাহায্য দেবে, মানবতা ছাড়া কূটকৌশলের মহাসুযোগে পাকিস্তান ভাঙার আনন্দও পাবে। পাকিস্তান টিকবে না, মিলে যাবে (এটা হয়নি অবশ্য) এটা তো ৪৭ থেকেই বল্লভ ভাই প্যাটেল বলে আসছিলেন। তাই গোমূর্খের মতো ১ মার্চের সংসদ অধিবেশন স্থগিত করলো ইয়াহিয়া।

জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করা হলো। অপমান, সমগ্র বাঙালিকে অপমান। কিন্তু সচেতন জনগণ ফেটে পড়লো। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, কেবল সংখ্যালঘু দলের ভিন্নমতের কারণে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেয় হয়েছে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমরা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি এবং আমরা এটা বিনা চ্যালেঞ্জে ওয়েতে দিতে পারি না।

শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। ২ মার্চ ঢাকায় হরতাল হলো। ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ ঢাকায় জনসভা। সামরিক বাহিনী কারফিউ জারি করলো। কারফিউ ভঙ্গ করলো জনতা। সৈন্যরা করলো গুলিবর্ষণ। ছাত্রসমাজ চাইলো স্বাধীন বাংলাদেশ। পতাকা উড়লো এবং ৭ মার্চ নিয়ে গুঞ্জন উঠলো।

বিদেশি ভাষ্যকাররা ভবিষ্যদ্বাণী করলো ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এটা তো সহজ কাজ নয়। বিরাট বাহিনী অস্ত্রে সুসজ্জিত। আমরা নিরস্ত্র। তাই সবদিক বিবেচনা করে ৭ মার্চ তিনি বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এটা তার বিবেচনা। কারণ, ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার সম্ভাব্য সার্বিক ফলাফল, তাই সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার অর্থ দাঁড়াতো সামরিক বাহিনীকে তার সব শক্তি দিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করা। এতে তারা যে কেবল শক্তি প্রয়োগের ছুতো খুঁজে পেতো তা-ই নয়, বলপ্রয়োগে তাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে তারা সবকিছুর ওপর সব উপায়ে আঘাত হানতো। কোনো নিরস্ত্র জনগোষ্ঠী কি ওই ধরনের হামলার আঘাত সহ্য করে বিজয়ী হতে পারে? বহির্বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়াইবা কী দাঁড়াবে? অন্যান্য দেশের সরকারগুলো কি স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে? একটি সুসংগঠিত সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য যতোদিন প্রয়োজন, ততোদিন টিকে থাকতে পারবে তো? এসব প্রশ্ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর বিরাজমান ভিন্নমুখী বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক স্বার্থগুলোর কারণে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে তারা মেনে নেবে এবং স্বীকৃতি দেবে তো? (মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল—ড. কামাল হোসেন, পৃ. ৬১)।

অবশ্য যা এড়ানোর জন্য এতো চেষ্টা, সেটা এড়ানো গেল না। সেই নারকীয় গণহত্যা শুরু হলো। যাহোক ৭ মার্চের বক্তৃতার তাৎপর্য অনুধাবন করা উচিত। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা এতে নেই সত্য, কিন্তু স্পিরিট রয়েছে—মর্মার্থ এর মধ্যে নিহিত আছে। একজন গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ মানুষ শান্তির পথে যেতে চান। তাছাড়া ছাত্রজীবন থেকে তিনি মুসলিম লীগ করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন। পাকিস্তান অর্জিতও হয়েছে। তাই তাকে ভাঙার কথা বলা তো দুরূহ। নাড়ি ছেঁড়া কী সহজ কথা। তাছাড়া একজন নেতার বিবেচনা থাকতে পারে। সে বিবেচনায় তার বক্তব্য। সে বক্তব্য কখনো সীমিত, কখনো সুদূরপ্রসারী। ৭ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে যে নিপীড়ন নেমে আসতো, তা ২৫-২৬ তারিখে নেমে এলো। বাঙালির যা হওয়ার তাই হলো। সংগ্রামই করতে হলো।

মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম। স্বাধীনতার সংগ্রাম, তাই ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ঐতিহাসিক এ অর্থে যে, এর মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার স্পিরিট ছিল।

৭ মার্চ : বাঙালির স্বরূপে উদ্ভাসের দিন

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

প্রস্তাবনায় নিবেদন যে, অতীব গুরুত্বের সঙ্গেই চিহ্নিত করে নেব কোটি বাঙালির জীবনে—বিশেষ করে আজ সাতই মার্চ এবং আত্মবিশ্বাসে ধারণ করে নেব হাজার বছরের বাংলায় এই দিন উজ্জ্বলতম এক মাইলস্টোন। এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে অবলোকন করছি—সন উনিশশ' একাত্তর, এসেছিল সেই দিন। সেদিনকার সাতই মার্চ—আগ্রাসী দুশমন কলোনিয়াল অপশক্তি পাকিস্তানিত্বের উৎখাতের নিশানায় রণাঙ্গনে লড়াইয়ের ডাক। তার পরের থেকে ইতোমধ্যে গড়িয়ে গেছে সাড়ে তিন দশকেরও বেশি। দেশের সৎ মানুষ মাত্রেরই অবশ্য জানা- সেই সাতই মার্চে অবধারিত নিয়তি কথা কয়েছিল কালের সন্তান মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে। ঢাকায় রমনার রেসকোর্স ময়দানে উপচেপড়া বিশাল জমায়েতে তার সে ডাক ছড়িয়ে গেল দেশের দূর-দূরান্তের জনপদ অবধি সবখানেতে।

বছরে বছরে পাড়ি দিয়ে দিয়ে আবারো আজ সাতই মার্চ। তবে নিশ্চয় নয় এ মোটা দাগের সংখ্যায় কোনো এক তারিখ মাত্র এবং নয় নস্টালজিয়ায় অতিচারিতা-চর্বণ। অবকাশ এসেছে, অবশ্য করেই খেয়ালে আনতে চাইছি সেই সাতই মার্চ, আর সুস্থ উত্তরাধিকার চেতনার ধারাবাহিকতাতেই বাংলাদেশ—বাঙালি আমাদের সাতই মার্চ অনিবার্যতায় উত্তরণ। লক্ষ করতে বলি, বলা হচ্ছে এমন করে আমাদের ইতিহাসে সাতই মার্চ—অনিবার্যতা। সচেতনজন সন্ধান নেবেন অমন করেই। তো আমাদের জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি- অনিবার্যতা; এসেছে ছাব্বিশে মার্চ : ষোলই ডিসেম্বর।

দুই. বাঙালিত্ব-আইডেনটিটির এবং বাঙালির একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, 'দেশমাতা সত্যে' অবিশ্বাসী হিংস্র দালাল জোটের কথা নিশ্চয় করেই বাদ রাখব, কালব্যবধান বটে, আজো কিন্তু তেমনটাই সুস্পষ্ট শুনতে পাই, কী কথা কয় 'দিবস' সাতই মার্চ। অগ্নিপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতীকী কণ্ঠে দেশব্যাপী

জনযুদ্ধের অমন মরণ-শপথ আহ্বান : ভায়েরা আমার ... প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং এই সঙ্গে কারো অমন দৃঢ়-কঠিন চ্যালেঞ্জ সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ইতিহাস সাক্ষ্য, অতঃপর আর অবশ্য অপেক্ষা করতে হয়নি। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সারাটাদেশ জুড়ে দ্রুত লড়াইয়ের ময়দানে কোটি বাঙালির কেমন দ্রুত জীবনবাজি উৎসর্গমন্ত্র কাতার বাঁধা এবং দীক্ষামন্ত্রের আওয়াজ—বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/বাংলাদেশ স্বাধীন করো : জয় বাংলা; বাংলার জয়।

এখন তা হলে বলবার- দেশপ্রেম-ইমানে যার ব্রত সংকল্প, বারংবার করেই তার কাছে ফরজতুল্য হয়ে আসে ওই সাতই মার্চের ডাক। এবং সেই খানে জানা, তাবৎ মুক্তির সংগ্রাম, সর্বার্থেই স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তিন. তবে গভীর দ্বিধায় প্রশ্ন জাগে—এ কোন বাস্তবতার পটে এই বর্তমানে আমাদের বসবাস? জবাবে যার যার নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাতেই তো জানান দিচ্ছে, চারদিক ছাপিয়ে কেমন বেজায় দুঃসময় আজ, অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে ভাঙনের ধস লেগেছে আমাদের সমুদয় শুভ মূল্যবোধে, মানুষে মানুষে প্রতারণা সীমাহীন অবিশ্বাস, মানবসম্পদের নির্বাসন, সর্বত্র ছড়িয়ে ফাস্ট্রেশনের পালা এবং গ্রাস করে নিয়েছে তৃণমূল অবধি জনমানুষের ঘরে-পরিবারে অভাব-বঞ্চনা-দারিদ্র্যের সর্বাত্মক হামলা। কী বলব? ইতি নেই অভিশপ্ত হেন এই মতো তালিকার। আর কী যে নিষ্ঠুর সত্য,—সব ছাড়িয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে বাঙালি লক্ষ-কোটি মানুষের একাত্তর-অর্জন-মার্চ অভিযান, সাতই মার্চের লড়াকু ডাক।

অতঃপর পুনরায় বলবার যে, উপরি বর্ণিত তাবৎ সত্ত্বেও আজকের এই দিনে আমাদের ওই সাতই মার্চ। যদি কবিতার চরণ থেকে ধার করে নিয়ে এমনতর বলা 'এসেছে সে একদিন/লক্ষ পরানে শঙ্কা না মানে আমাদের একাত্তর মার্চে সেই ইতিহাসের সূচনা-প্রহর,। তবে অবশ্যই অকস্মাৎ ঘটে না কিন্তু এমন। পটভূমিতে বয়ে আসে ইতিহাসের ধারা। অতএব অতি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি, এই মতো সম্মানের তাগিদ-কেমন করে কোন সড়ক ধরে দিবস সাতই মার্চে আমাদের উত্তরণ।

লক্ষ করব,—অবশ্যই নয় কাকতালীয় যোগাযোগ এই সেদিন গেল আমাদের ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি, দীক্ষা আমাদের 'একুশে' সত্যে; আজ উদযাপন করছি মার্চ সাতই। প্রাণিত আমরা লাস্ট ফ্রন্টিয়ারে মুক্তির স্বাধীনতার সংগ্রামী মন্ত্রে। এখন তবে সেই সড়ক।

চার. সৎ এবং সচেতন বিশ্বাসের সবারি জানা—ব্রিটিশ ইন্ডিয়া নামের উপমহাদেশে একদা কায়েম হয় উদ্ভট অবয়বের সেই রাষ্ট্র পাকিস্তান পৃষ্ঠপোষক মার্তববর তারা প্রচার করতেন Homeland of Indian Muslims প্রশ্ন আদপেই এবং সম্পূর্ণতই তাই কি? উন্মত্ততার তালেমাতা গগনবিদারী স্লোগান ছিল লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। তা তদর্থে লড়াই কিন্তু মোটেই করতে হয়নি। নেতা-কর্মী কারুকেই একবেলার জন্য হলেও ইংরাজ সরকারের জেলহাজত খাটতে হয়নি। আসলে গোড়াতে কাজ করে গেছে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে) তখনকার সময়কার আশু কার্যকারণ হেতু, বণিকী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ স্বার্থ। লন্ডনে বসে ওদের পার্লামেন্টে প্রস্তাব গৃহীত হয় Partition of India Act. 1947. এবং All India Muslim League Avi All India Congress-এই দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাগাভাগি, ক্ষমতার হস্তান্তর। আর তাই থেকে ওদের জন্য India/ভারত/হিন্দুস্থান এবং আমাদের বরাতে পাকিস্তান।

বলা গেছে উদ্ভট সেই রাষ্ট্র। কেন তবে এমন হবে। বিশেষিত করা 'উদ্ভট' সহজ জবাবে জেনে রাখতে চাইব—দেশরাষ্ট্র যখন, প্রথমতই তখন ভৌগোলিক সংশ্লিষ্টতা মোটে থাকবে না? বাসিন্দা মানুষে মানুষে মিল-সমন্বয়? বাস্তবতায় হয়েছিলটা কী? হাজার দেড় হাজার মাইলের দুস্তর দূরত্বে দুই ভূগোলাংশের দুটো অঞ্চল। এবং আবার এদিকটায় বলা হচ্ছে জাতীয় পরিচিতিতে পূর্বের-পশ্চিমের প্রান্তের সবাই মিলে এক জাতি 'পাকিস্তানি'। কিন্তু এই নয়াবানানো পাকিস্তানিদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক/এথনিক বৈশিষ্ট্যে, ভাষা-সংস্কৃতি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে রয়ে গেছে বিশাল ব্যাপক ফারাক। তবে করাচি-লাহোর-পিন্ডিকেন্দ্রিক সিংহাসনে প্রভুশক্তির তরফে প্রচারণা চালানো হতো Five thousand years of pakistan উচ্চকণ্ঠে সদ্য জানান দেওয়া হতো Pakistan has come to stay এবং শরা-শরিয়তের দোহাই পেড়ে তুঙ্গে সে কী জিগিরের বহর—পাকিস্তান মানেই ইসলামী হুকুমৎ, ইসলামী উম্মাহ, ইসলামী কওম। তথাপি আমাদেরই সরাসরি অভিজ্ঞতা—সেই জিগিরের অছিলাতে শাসক-শোষক পাকিস্তানঅলাদের সর্বগ্রাসী আছর এসে পড়েছিল এই বাংলায়, এই বাংলার মানুষের ওপরে।

সদ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল প্রত্যাখ্যাত আগ্রাসনের অবসান ঘটেছে : অতঃপর এখন আরেক চেহারাতে পাকিস্তানিত্বের আগ্রাসন। এলো ভাষা-দাসত্বের হামলা। এলো পরভাষা উর্দুর লেবাসে। সেই একই জিগির—উর্দুভাষার হরফ মূলে রয়েছে 'পবিত্র' আরবি। অতএব ইসলামিয়াতের দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। আসলে শাসক জোটের ভাষা ছিল উর্দু। ওদের শাসন-শোষণের স্বার্থেই তাই উপনিবেশ বাংলা অঞ্চলের বাঙালি জনমানুষের ওপরে উর্দুকে চাপানোর যতো অপপ্রয়াস। আর পাকি কায়েদে আজম তো ফরমানই জারি করে দিয়েছিলেন, Urdu and Urdu alone shall be the State Language of Pakistan তবে মোকাবিলায় আমরাও কিন্তু জিগিরে বিভ্রান্ত হইনি; ফরমান মাথা পেতে নিইনি। আমাদের দিক থেকে প্রতিরোধ সেই প্রথম থেকেই। পাকিস্তান কায়েমের শুরু থেকেই লক্ষ করবার যে, আমাদের প্রতিবাদী প্রতিরোধী প্রত্যয় দানা বেঁধে উঠছে। অভিভাবক কাজী মোতাহার হোসেন এখন চূড়ান্ত করেই জানিয়ে দিচ্ছেন—বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ওপর রাষ্ট্রভাষারূপে চাপাবার চেষ্টা করা হয়,তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। শিগগিরই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হওয়ার আশঙ্কা আছে। যুগপৎ অপর অভিভাবক ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সতর্কবাণী—মোটের উপর বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য। এবং সাথে যোগ দিচ্ছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর উচ্চারণে আমাদের বাঙালির আইডেনটিটির মৌল সত্যটি—আমরা বাঙালি এটি একটি বাস্তব কথা।

এখন চিহ্নিত করে নেব, সেই যাত্রা শুরুর কাল থেকেই তো মাতৃভাষা বাংলার অধিকার নিয়ে, আর্থ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির অভিযান নিয়ে এবং মাটির সন্তান স্বরূপে বাঙালিত্ব নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরুর পালা। ক্রমে ওদের বাঁধন যতোই শক্ত হয়েছে বাঙালিত্বের মুক্তির সড়কে দুঃসাহসী প্রতিরোধী আমাদের অভিযান ততোই একটা কাতার বাঁধা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে সন উনিশশ' বায়ান্ন, মাস ফেব্রুয়ারি এবং যেন অবশ্য করেই প্রতীকী একুশে। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর।

অতঃপর প্রস্তাব যে, চিহ্নিত করে যাব একেক নিশানফলক, কথা কয় কাল সময়ের কণ্ঠ। চুয়ান্নতে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয়, সাতান্নতে টাঙ্গাইল কাগমারীতে সংস্কৃতি সম্মেলন, একষট্টিতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, বাষট্টিতে ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোল, ছয়ষট্টিতে আর্থ ছয় দফা আন্দোলন,

সাতষট্টিতে আবারো রবীন্দ্র আন্দোলন এবং তার পরপরই তো উনসত্তরে পাকিস্তানিত্বকে হটাবার নিশানায় সারাটা দেশজুড়ে অমন ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান।

ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছি আমরা সেই ইতিহাস ধারার শেষ প্রান্তে—সামনেই সত্তরের নির্বাচন। আওয়ামী লীগের ব্যানারে বাংলার জনমানুষের চূড়ান্ত বিজয়। লক্ষ-কোটি কণ্ঠে ঈমানের সেই মহত্তম উচ্চারণ দিকে দিকে উঠে বাজি—তোমার দেশ আমার দেশ/বাংলাদেশ বাংলাদেশ, আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে।

বলাবাহুল্য, বর্তমান অবকাশে পটভূমি কথার কেবল রূপরেখাটি তুলে ধরবার প্রয়াস খানিক পাওয়া গেছে। অবলোকন করতে চেয়েছি—কোন সড়ক ধরে এগিয়ে আসছে বাঙালির একাত্তর, একাত্তরের মার্চ : ক্রমে কেমন হয়ে উঠছে আমাদের নেশন স্টেট - বাংলাদেশ।

সমকাল : ৭ মার্চ, ২০০৮

পেছন ফিরে ৭ মার্চ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

একাত্তরের মার্চের মতো ঘটনাবহুল মাস এ দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার আট দশকব্যাপী জীবনে যে নেই, আমি হলফ করে বলতে পারি। পুরো একটি মাস যার প্রতিটি দিন ছিল আশঙ্কা উদ্বেগ প্রত্যাশায় ভরা। পুরো একটি মাস যে সময় সমমগ্র দেশ এক টানটান উত্তেজনায় শক্ত হয়ে বসেছিল, পুরো একটি মাস যখন সারা দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একজন মানুষের ওপর, যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

কী অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেদিন শেখ মুজিব, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তার নেতৃত্বে, তার নির্দেশে যে অসহযোগ, এমন সফল অসহযোগ ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে নেই। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ ছিল আদর্শগতভাবে অহিংস, তবে শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি শেখ মুজিবের অসহযোগও ছিল আদর্শগতভাবে অহিংস, তবে সহিংসতা রোধ করা যায়নি শেষ পর্যন্ত। সব গণআন্দোলনের প্রকৃতি বোধহয় এই—আন্দোলনের জোয়ারে সব নিয়মশৃঙ্খলা একপর্যায়ে ভেসে যায়। নেতৃত্ব তখন অসহায় দর্শকে পরিণত হয়।

সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের আহূত জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বঙ্গবন্ধু। এভাবেই প্রচার হয়েছিল। ইতোমধ্যে অসহযোগের সাফল্য সারা দেশ দেখেছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণায় (১ মার্চ) সারাদেশ ছিল ক্ষুব্ধ, স্তম্ভিত। একদিকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া অসংখ্য কর্মীর প্রত্যাশা অন্যদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংলাপের বাধ্যবাধকতা। সেখানে কোনো ভুল পদক্ষেপের ফাঁদে না-পড়া, এমন এক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করতে হয়েছিল রেসকোর্সের জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কী বলবেন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কী নির্দেশনা দেবেন। অনেকের আশা ছিল, তিনি এই মুহূর্তকেই বেছে নেবেন স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য। চাপও ছিল। কিন্তু তিনি সে ভুল করেননি। স্বাধীনতার ঘোষণা

দেননি। তবে আইন রক্ষা করে তার যতো কাছে যাওয়া সম্ভব, তা-ই করেছিলেন। গান্ধীজির কুইট ইন্ডিয়া আহ্বানের সঙ্গে এখানেই তফাৎ এই আহ্বানের। গান্ধীজি দেশবাসীকে উদ্দেশ করে কিছু বলেননি, যা বলার বলেছেন প্রতিপক্ষকে। বঙ্গবন্ধু এই বক্তৃতায় একই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে হুশিয়ার করেছেন ও দেশবাসীকে বলেছেন প্রস্তুত থাকতে। এবং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তির কথায় কাজ হবে না। অস্ত্রের ভাষাতেই যা বলার বলতে হবে। তিনি জনতার প্রতিরোধের শক্তিতে আস্থা রেখেছেন। এবং চূড়ান্ত জয়ের প্রশ্নে কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি।

ইতঃপূর্বে কোনো এক লেখায় আমি বলেছি, সাতই মার্চের ঘোষণাকেই বাংলাাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা গণ্য করা যায় । না, তা করা যায় না। ওই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য সতর্কভাবে উচ্চারিত। ওই বক্তৃতায় স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না। তবে স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষ প্রস্তুত, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এটা মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস। একমাত্র সে বিবেচনাতেই ওই দিনকে দেশের স্বাধীনতা দিবস গণ্য করা যায়। ছাব্বিশে মার্চ নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু সাতই মার্চ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কোনো অস্পষ্টতা নেই।

একাত্তরের প্রবাসী সরকার বিভিন্ন বিবেচনায় ছাব্বিশে মার্চকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে। সাতই মার্চ এর ফলে তার গুরুত্ব হারায়নি। এর গুরুত্বের ভিত্তি খুব মজবুত। সেদিন এক জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে সেটা অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। এর তুলনা খুঁজতে হলে দেশের ইতিহাসের বাইরে যেতে হবে। সাতই মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত প্রত্যয়কে চেতনায় ধারণ করে বাঙালি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে লড়েছে ও জয়ী হয়েছে।

এই বক্তৃতায়, আগামী মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে তার সম্ভাব্য অনুপস্থিতির কথাও বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি...। ২৫ মার্চে দিনগত রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন বঙ্গবন্ধু। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে। সাতই মার্চের ওই একটি বাক্যের মধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ২৫ মার্চের রাতের ওই আত্মসমর্পণ আগে থেকেই তার মাথায় ছিল। ওই রাতে কী ঘটেছে বা কী ঘটতে যাচ্ছে, তিনি জানতেন। রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথি সবাইকে আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়ে নিজে আত্মসমর্পণ, কোনো

সিদ্ধান্তহীনতার বিষয় নয় বরং একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। তর্ক চলতে পারে। সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল কি ছিল না, তবে এটা যে দুর্বলের আত্মসমর্পণ নয়, আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান এক নেতার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

এই আত্মপ্রত্যয়—এটা কী ধরনের আত্মপ্রত্যয়? এ এক নেতার আত্মপ্রত্যয়, যিনি একটি জাতির আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন এবং যিনি একটি উজ্জীবিত জাতির হৃৎস্পন্দনকে কাছে থেকে শুনেছেন। যার ডাকে লাখো মানুষ জাদুমন্ত্রে জড়ো হয় রেসকোর্সের ময়দানে। তিনি জানেন, তার আসল কাজ তিনি করে ফেলেছেন। জাতিকে একটি চেতনায় একটি আকাঙ্ক্ষায় তিনি একতাবদ্ধ করেছেন। এ জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না এবং পশুশক্তির কাছে পরাজিত হবে না এ জাতি। তার এই হিসাবটা যে কত সঠিক ছিল, পরবর্তী নয় মাসের ঘটনাবলি তা-ই প্রমাণ করেছে। আমি যদি না-ও থাকি—কথাটার তাৎপর্য গভীর। তার থাকা না-থাকা এরপর আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তিনি না থাকলেও তার জাতি এগিয়ে যাবে, যার শক্তির ভাণ্ডার তিনি সৃষ্টি করেছেন ও প্রত্যক্ষ করেছেন। যে ঐক্যের বাঁধনে তিনি সেই দুর্দিনে জাতিকে বেঁধেছিলেন, সেই ঐক্যই মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কেবলই অস্ত্রের লড়াই ছিল না, ছিল এক মনস্তত্ত্বের লড়াই। এ লড়াইয়ে জয়ের অমোঘ অস্ত্রটি বঙ্গবন্ধু তার স্বদেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর অসামান্য নেতৃত্বের উত্থান-পর্বের শেষ শীর্ষবিন্দু এই সাতই মার্চের ভাষণ। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বটি নিয়ে নানা মত আছে। সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। পরিস্থিতিভেদে নেতৃত্বের প্রকৃতিও বদলায়। জাতির উত্থান-পর্বে বা গভীর সংকটে প্রয়োজন যে নেতৃত্বের, প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জনের পর যে ভিন্ন চাহিদা, সে চাহিদা প্রায়শই উত্থান-পর্বের নায়ক পূরণ করতে পারেন না—সে জন্য প্রয়োজন হয় ভিন্নতর মেধার, ভিন্নতর প্রতিভার। দুই ভিন্ন প্রতিভার সমাবেশ একই ব্যক্তির মধ্যে, এক বিরল ঘটনা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে, মাও সেতুংয়ের মধ্যে হো চি মিনের মধ্যেও সম্ভবত এটা ঘটেছিল। সব তথ্য আমার জানা নেই। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু নিহত না হলে, দেশকে তিনি কী উপায়ে কোন পথে পরিচালিত করতেন, সেই ভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতেন কি হতেন না—সে আলোচনা আজ একেবারেই অনাবশ্যক। যে কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা তিনি মনে মনে এঁকেছিলেন তা নিমেষেই মুছে গিয়েছিল এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে মঞ্চে দেখা দিয়েছিল তার হত্যায় যারা রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এলেন, সেই নতুন নেতৃত্ব।

নতুন নেতৃত্বের বড় দুর্বলতা ছিল, এটা কোনোভাবেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না, রাজনীতির চর্চার পথে এ নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়নি। পঁচাত্তর থেকে নব্বই, ১৫ বছর কাল বাংলাদেশ এই মেকি ও আরোপিত নেতৃত্বে শাসিত হয়েছে এবং যতো দিন গিয়েছে, প্রকৃত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে এর চরিত্রগত তফাৎ ততোই স্পষ্ট হয়েছে। এবং দেশের দুর্ভাগ্য, এ নেতৃত্ব নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরপর আপাতদৃষ্টিতে বিদায় নিলেও এ এক মারাত্মক উত্তরাধিকার। গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে নষ্ট করে রেখে যাওয়ার উত্তরাধিকার। গণতন্ত্রের সেই ভাঙাঘর আবার খাড়া করতে পারেনি পরপর তিনটি নির্বাচিত সরকার। এমনকি মেরামতের কাজ হাত নেবে, সে ইচ্ছাটি পর্যন্ত দেখাতে পারেনি নামসর্বস্ব নির্বাচিত সরকার। স্বৈরতন্ত্র বিদায় নিয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র সে শূন্যতা পূরণ করেনি।

স্বৈরাচারের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বা ব্যবস্থার একটি হলো সংসদ ও সংসদীয় নির্বাচন। গণতন্ত্রের চাকা সচল রাখে নিয়মিত ও সুষ্ঠু নির্বাচন। স্বৈরতন্ত্র সবচেয়ে বেশি ভয় পায় নির্বাচনকে। আমরা গণতন্ত্রের মুখোশধারী রাজনৈতিক সরকারও দেখেছি, যারা বিদায়ী স্বৈরতন্ত্রের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার বহন করেছে ও নির্বাচনকে নানা কৌশলে প্রভাবিত করতে চেয়েছে। আমলা গোষ্ঠীর মাথায় লাঠি ঘুরিয়েছে। বিচার বাবস্থাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল করেছে। কোনো ক্ষেত্রেই স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা রক্ষা করেনি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে মাটি চাপা দিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্যে নিজেদের ক্ষমতার নিরাপত্তা খুঁজেছে।

পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ফলে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ তার স্বপরিচয়ে স্থিত হতে পারেনি। একাত্তরের সাতই মার্চ আর আজকের সাতই মার্চের মধ্যে ৩৮ বছরের ব্যবধান। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আবার স্বাধীনতার সারবস্তু হারিয়েছে, স্বাধীনতার খোলস নিয়ে বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে। জরুরি অবস্থার মতো একটি আলো-আঁধারির জগতে ঠেলে দিয়েছে দেশকে। বঙ্গবন্ধু এক অসামান্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু নেতৃত্বের উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেননি। সে জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। একাত্তরের সাতই মার্চে তিনি যে উচ্চতায় উঠেছিলেন, কৃতজ্ঞ জাতি আজ সে-কথাই স্মরণ করবে, তাঁকে তার প্রাপ্য সম্মান জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

প্রথম আলো : ৭ মার্চ ২০০৯

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা
হাসনাত আবদুল হাই

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবনেই সুবক্তা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তার বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের সম্পূরক ছিল অসাধারণ বাগ্মিতার পারদর্শিতা। জন্মগত প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বক্তৃতাকে রূপান্তরিত করেছিলেন এক মনোহর শিল্পে। এই শিল্পরূপের বৈচিত্র্য অতুলনীয়। এখানে যেমন যথাশব্দের ব্যবহার এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, একই সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে বাচনভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের অনায়াস নিয়ন্ত্রণ। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা প্রায়োগিক সার্থকতায় বিস্ময়কর। সময়, প্রেক্ষাপট এবং শ্রোতার প্রকৃতি সামনে রেখে তিনি নির্ধারিত করেছেন বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের আন্দোলিত ধ্বনি এবং উচ্চারিত কথামালা। অধিকাংশ সময়েই তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তাৎক্ষণিকভাবে, পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই। মঞ্চে উঠার পূর্বমুহূর্তে অথবা মঞ্চে উঠেই তিনি শ্রোতার সমাবেশ দেখে মনে মনে রচনা করে নিয়েছেন বক্তৃতার কথা। বক্তৃতার সময় তাকিয়েছেন সামনে, বায়ে এবং ডানদিকে যেন জনতার সব অংশই নিমিষে সম্পৃক্ত হয়ে যায় মঞ্চে বক্তৃতাদানকারী নেতার হৃদয় ও কণ্ঠস্বরের সঙ্গে। তার বক্তৃতা সেতুবন্ধ হয়ে বক্তা ও শ্রোতাকে অবিচ্ছিন্ন করে গড়ে তুলেছে, রচনা করেছে দুর্মর নৈকট্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রায় সব বক্তৃতা বক্তব্যের স্পষ্টতায়, বাচনভঙ্গির ওজস্বিতায় এবং অভিঘাতের গভীরতায় স্মরণীয়। এদের মধ্যে ১৯৭১-এ ৭ মার্চের বক্তৃতা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ এমন এক বক্তৃতা যা বারবার শোনার মতো। এ বক্তৃতা শুনে শিহরিত, আলোড়িত হয় দেহ-মন। আবেগ এবং যুক্তির এক অত্যুজ্জ্বল মিশ্রণ ঘটেছে এ বক্তৃতায়। আবেগ ও মননের কাছে আবেদনে ৭ মার্চের বক্তৃতা কালজয়ী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা বলা হলে যথেষ্ট হবে না। সেই বক্তৃতা ছিল পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা। ভাষার শক্তিতে, আবেগের স্ফুরণে এবং বক্তব্যের শাণিত ক্ষুরধারে ৭ মার্চের বক্তৃতা ছিল অসাধারণ এবং

অদ্বিতীয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো রাজনীতিবিদ বা গণনায়ক কখনও এমন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে, তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় এবং সময়োপযোগী করে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার উদাহরণ নেই। বঙ্গবন্ধু ভালো বক্তা ছিলেন এবং সবসময়ই বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু ৭ মার্চের বক্তৃতা শুধু তার নিজের অতীত সব বক্তৃতা নয়, আরও অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নেতার বক্তৃতাকে অতিক্রম করে গেছে। তুলনায় কাছে আসতে পারে এমন কোনো বক্তৃতার কথাও মনে করা যায় না, এতোই বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী ছিল তার সেই বক্তৃতা। তার সামনে উপস্থিত ছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাসহ লাখো জনতা। বক্তৃতা শুনে কেবল তারাই অনুপ্রাণিত, উদ্দীপ্ত এবং সংকল্পবদ্ধ হয়নি; যারা রেডিওতে শুনেছে, অযুত, কোটি সেই সব শ্রোতাও প্রত্যক্ষদর্শীদের মতো একইভাবে আবেগে, উচ্ছ্বাসে এবং অকুতোভয়ে উদ্বেলিত হয়েছে। বক্তৃতার প্রতিটি কথা স্পর্শ করেছে হৃদয়ের তন্ত্রী এবং একই সঙ্গে মনন ও প্রাজ্ঞতার যৌক্তিক মানদণ্ড। সেই বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলতে হয়েছে, আবার একই সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের দাবি ও অধিকার মেনে নেয়ার জন্য শাসকদের শেষ সুযোগ দিয়ে আহ্বান করা হযেছে। বিপরীত দুই শক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য এমন মোক্ষম বক্তব্য উপস্থাপন এক অভাবনীয় কৃতিত্ব। দ্ব্যর্থবোধক মনে হলেও ৭ মার্চের বক্তৃতায় সুযোগসন্ধান ও চতুরতার ভূমিকা ছিল না, বক্তৃতাটি ছিল সময়ের দাবি ও প্রয়োজন মনে রেখে এমন এক ঘোষণা ও অঙ্গীকার—যেখানে সমসাময়িক বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছে। সেই বক্তৃতায় প্রতিফলিত হযেছে কোটি কোটি বাঙালির প্রাণের কথা, তাদের ক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামী সত্তার বজ্রকণ্ঠ। জনগণের নেতা হয়ে বঙ্গবন্ধু রক্তপিপাসু হন্তারক প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, এ দেশের মানুষকে চোখ রাঙিয়ে, বেয়নেট-বুলেট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব না, ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না। যদি স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে না নেয়া হয় এবং বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ শাসনের সুযোগ দেয়া না হয়, তাহলে স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে অনিবার্য, এ ঘোষণাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার বক্তব্যে। জনগণকে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন তিনি স্পষ্ট ভাষায় । তিনি তাদের ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছেন, যার যা আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।

৭ মার্চের বক্তৃতার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে যদি জনগণের অধিকার মেনে নেয়া না হয় তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, তার উল্লেখ করে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ন্যায্য পাওনা দেয়া না হয়,

তাদের রাষ্ট্রের পরিচালনা ভার থেকে বঞ্চিত করা হয় তা হলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতরেই বাঙালিদের অধিকার রক্ষার জন্য শাসকদের শেষ সুযোগ দেয়ার ইঙ্গিত।

১ মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাকে সহায়তা করেছিল জুলফিকার আলী ভুট্টো। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ শাসনে যতোটা না উৎসুক ও উদগ্রীব ছিল তার চেয়েও বেশি আগ্রহী ও সংকল্পবদ্ধ ছিল স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠেছে এবং ক্রমেই সেই দাবি গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে; যার অন্তিমে ছয় দফার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নর-নারী নির্বাচিত করেছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে। যখন দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক আমলা এবং শিল্পপতিদের চক্র বাঙালিদের ক্ষমতায় আসতে দিতে চায় না তখন স্পষ্ট হয়ে গেল তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতেও সম্মত নয়। ১ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করে সামরিক সরকার তাদের এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে নিয়ে এলো। ক্ষোভে, প্রতিবাদে এবং ঘৃণায় ফেটে পড়ল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি। কেন্দ্রের শাসন উপেক্ষা করে তারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে প্রদেশের দৈনন্দিন সরকারি কাজকর্ম সম্পাদনে সহযোগিতা করল। প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় লাখ লাখ মানুষের মিছিল বের হলো, প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হলো এবং অধিকার আদায়ের জনা দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত হলো। সামরিক সরকার বেগতিক দেখে দর-কষাকষির জন্য বৈঠকের ব্যবস্থা করল; কিন্তু একই সঙ্গে বিদ্রোহ দমনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্লেন বোঝাই করে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রও আনতে থাকল। এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেল, তারা মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছাত্রনেতারা সময়ক্ষেপণ না করে বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের ওপর স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিলো। তারা পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে তার স্থানে উড়িয়ে দিলো বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত সবুজ পতাকা।

৭ মার্চের বক্তৃতার আগে বঙ্গবন্ধু দুটি বিপরীত স্রোতের মাঝখানে দেখতে পেলেন নিজেকে। একদিকে ছাত্র-জনতার দাবি—এখনই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হোক, অন্যদিকে চতুর সামরিক শাসক ও তাদের দোসরদের পক্ষ থেকে

সমঝোতায় আসার জন্য বৈঠকের আহ্বান। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু যে উভয় সংকটে পড়লেন তার তুলনা নেই কোনো রাজনৈতিক নেতার অভিজ্ঞতায় এবং জীবনে। এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়নি আর কোনো জননেতাকে, কোনো দেশে, কোনো সময়ে। বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে ৭ মার্চ ছিল সবচেয়ে কঠিন এক পরীক্ষার মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ, ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচন করেছে এবং নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছে। টালবাহানা করার পর যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দলবল নিয়ে ঢাকায় এসে ছয় দফা নিয়ে আলোচনা করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে তখন সেই উদ্যোগকে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আবার যে উত্তাল জনসমুদ্র প্রতিদিন রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামী স্লোগান দিচ্ছে তাদের আশ্বাস দেয়া না হলে তা যে হবে হতাশাব্যঞ্জক, সে কথাও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। ছাত্রদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের পর জনতার পক্ষ থেকে স্বাধীনতার জন্য ঘোষণার দাবি প্রায় দুর্বার হয়ে উঠল। ৭ মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে এই দুই বিপরীত স্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমন বক্তব্য রাখতে হবে, যা তাকে জনতার দাবি রক্ষার প্রতিই অধিক দায়িত্বশীল এবং আন্তরিক বলে প্রমাণিত করবে। এমন কঠিন বক্তৃতা বঙ্গবন্ধুকে আগে কখনও দিতে হয়নি, পৃথিবীর কোনো নেতার সামনেও এমন পরীক্ষা এসে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়নি। বক্তৃতায় কী বলবেন, কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবেন, আবার একই সঙ্গে শত্রুশিবিরে ভীতির সঞ্চার করে দেবেন, এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সময় পাননি বঙ্গবন্ধু। তাকে খুব স্বল্প সময়ে ভেবে নিতে হয়েছে, ঠিক করতে হয়েছে তার বক্তব্য। আর এটা তাকে করতে হয়েছে প্রচণ্ড চাপের মুখে। কারও সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শের সুযোগ পাননি তিনি, কোনো ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা মনেও আসেনি তার; কেননা ইতিহাসে এমন ঘটনা, সংকট ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হননি কোনো নেতা। বেশ বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুকে একাই ভাবতে হয়েছে কী বলবেন জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে, কোন কথা শুনে তারা উদ্দীপ্ত হবে, তাদের সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত থাকবে। যাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন সমঝোতার শেষ সুযোগ দেয়ার জন্য তাদেরই বা কিভাবে বোঝানো যাবে যে দাবি মেনে না নিলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনিবার্য। চূড়ান্ত ভাষায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলে সমঝোতার শেষ সুযোগ দেয়া যাবে না সামরিক শাসকদের, আবার স্বাধীনতার উল্লেখ করা না হলে সংগ্রামী চেতনায় অকুতোভয় জনতা সন্তুষ্ট হবে না। এই উভয় সংকটে থেকে বঙ্গবন্ধু মনে মনে তৈরি করে নিয়েছেন ৭ মার্চের বক্তৃতা, একথা বেশ বোঝা যায়। এ ছিল এমন

এক বক্তৃতা, যা শুনে শ্রোতার ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে বন্যার প্রবল স্রোতের মতো, তাদের হৃৎপিণ্ডের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিত হয়েছে মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে। ৭ মার্চের বক্তৃতায় স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামের ঘোষণা ছিল। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—এ কথায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। ৭ মার্চ পর্যন্ত সংগ্রাম চলছে এবং চলবে, যতোদিন না বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, একথা বঙ্গবন্ধু জানতেন। পূর্বাপর বক্তৃতাটি শোনা হলে শাসকদের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন নিয়ে যে আলোচনা সেটিও এই সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আলোচনা ব্যর্থ হলে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে তারও ইঙ্গিত এবং নির্দেশনা রয়েছে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো—এ ঘোষণায়।

দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু কি আপসের চেষ্টা করেছিলেন? ৭ মার্চের বক্তৃতা কি ছিল দ্ব্যর্থবোধক? প্রতিটি লাইন পড়া হলে, চলমান ঘটনা স্মরণ করলে এ ধারণা অমূলক মনে হবে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের জন্য স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবি নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন এবং সেই স্বায়ত্তশাসন আদায় করার উদ্দেশ্যে আলোচনায় শেষবারের মতো বসতে রাজি হয়েছিলনে। আলোচনায় ছয় দফার কোনো অংশ নিয়েই তিনি এবং তার সহকর্মীরা ছাড় দেননি, সুতরাং স্বায়ত্তশাসন, যা ছিল স্বাধীনতারই নামান্তর বা ভূমিকা, সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কোনো দ্ব্যর্থবোধক অবস্থান গ্রহণ করেননি। যদি এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অস্বীকৃত থাকতো এবং সমারিক শাসক শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি উপেক্ষা করে, তাহলে সশস্ত্র সংগ্রামই হবে একমাত্র উপায়—এ ঘোষণাও ছিল ৭ মার্চের বক্তৃতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। শুধু সময় নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। এক অংশ চেয়েছে ৭ মার্চেই স্বাধীনতার ঘোষণা এবং যুদ্ধ শুরুর নির্দেশ। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং যুদ্ধ শুরুর জন্য বাঙালিদের প্রস্তুত হতেও বলেছেন। কিন্তু আলোচনায় শাসক শ্রেণীকে বাঙালিদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য শেষ সুযোগ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বিপ্লবী নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাকে জনগণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির কথা যেমন মনে রাখতে হয়েছে, দাবি আদায়ের পর্যায়ক্রমিক ধাপের প্রসঙ্গেও সচেতন থাকতে হয়েছে। এখানে আপসের প্রশ্ন ছিল না, ছিল ধৈর্য প্রদর্শন ও যুক্তির সহায়তায় দাবি আদায়ের কৌশল। এই কৌশল যখন সফল হয়নি তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আরও আগে ৭ মার্চের

বক্তৃতায়। কেউ বলতে পারবে না যে, তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য জনগণকে প্রস্তুত হতে বলেননি। তবে তার হয়তো একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে রক্তপাত ছাড়াই বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতা (স্বায়ত্তশাসন) অর্জিত হবে। তিনি রক্তপাত চাননি, হত্যাকাণ্ডে তিনি শোকাভিভূত হয়েছেন, তাই সামরিক শাসকদের তর্জনী তুলে বলেছেন—আর যদি একটা গুলি চলে...। খুব সংক্ষিপ্ত ছিল ৭ মার্চের বক্তৃতা কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায়, গুরুত্বে এবং ব্যাপকতায় এর সমতুল্য দ্বিতীয় বক্তৃতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আব্রাহাম লিংকন গেটিসবার্গ বক্তৃতা দিয়েছেন মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তার বিশ্বাস এবং ধারণা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে। বেশ ভেবেচিন্তে অনেক সময় নিয়ে লেখা সেই বক্তৃতা। উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেভার সো মেনি শীর্ষক যে বক্তৃতায় ব্যাটল অব ব্রিটেনে নিহত বৈমানিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সেটিও সুলিখিত এবং বেশ চিন্তা-ভাবনা করে লেখা। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে যে বক্তৃতা দেন সেটি প্রায় তাৎক্ষণিক জনসভায় দাঁড়িয়েই অথবা তার অব্যবহিত আগে তাকে ঠিক করতে হয়েছে কী বলবেন। তার সময় ছিল না ভাবনা-চিন্তার, তদুপরি ছিল অসম্ভব চাপ। এ সত্ত্বেও যে বক্তৃতাটি তিনি রেসকোর্সের জনসমুদ্রের সামনে দিয়েছিলেন সেটি অবিস্মরণীয়। পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বক্তৃতা হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে চিরকাল।

বহুবছর হলো ১৯৭১-এর ৭ মার্চ অতিবাহিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এখনও বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তৃতা যখন শোনা যায়, শ্রোতার প্রতিটি লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়, আবেগে উদ্বেলিত হয় মন এবং প্রবল শক্তিতে জেগে ওঠে সব চেতনা। কথামালার এই অবিনশ্বরতা আর কোনো বক্তৃতায় রয়েছে বলে জানা নেই। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা আমাদের অমূল্য উত্তরাধিকার, যার গৌরব অনুভূত হবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

প্রসঙ্গ : ঐতিহাসিক ভাষণ
মাহমুদুল বাসার

একটি বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করেছে। এই অভিধাটি পেয়েছেন তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের পর। তার আগে পাননি। এই একটি ভাষণই বঙ্গবন্ধুকে বিবিসির শ্রোতাদের ভোটে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিজয়ী করেছে। দ্বিতীয় হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় হয়েছেন নজরুল। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নজরুল-বঙ্গবন্ধু একই বৃন্তে তিনটি ফুল, তিনজনই কবি। কবিরা জনগণকে যতো গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেন, অন্যরা তা পারেন না। রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা, নজরুলের কারার ঐ লৌহ কপাট গান দুটো আমাদের একাত্তরে সাংঘাতিক উদ্বেলিত এবং প্রভাবিত করেছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের মহাভাষণকে কবি নির্মলেন্দু গুণ কবিতাই বলেছেন। বঙ্গবন্ধুকে বলেছেন কবি। গুণের কবিতার অংশটি এমন : একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে কখন আসবে কবি?

নির্মলেন্দু গুণ যথার্থই একাত্তরের সাত মার্চের মহাভাষণের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন তার কবিতায়। কমপক্ষে দশ লক্ষ মানুষ অধীর, উন্মত্ত, উৎকণ্ঠিত আবেগে রেসকোর্সের বিশাল ময়দানে অপেক্ষা করছিলো। এছাড়া, যারা ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সশরীরে উপস্থিত হতে পারেননি, তারাও কান পেতে ছিলো ঐ ভাষণের দিকে। সেদিনের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মনোনিবেশ করেছিলো বঙ্গবন্ধুর মহাভাষণের দিকে। তারা শুনেছিলো, ঢাকা বেতার থেকে ভাষণটি রিলে করা হবে। তারা ছুটে গিয়েছিলো রেডিওর কাছে, কিন্তু সরকার প্রচার বন্ধ করে দেয়। মানুষ ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়। ঢাকা বেতারের কর্মচারীরা ধর্মঘট করে। বাধ্য হয়ে সরকার ৮ মার্চ সকালে ভাষণটি প্রচার করে। আমি একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণটি শুনি। ভাষণটি শেষ হওয়া মাত্র মানুষ আপন ইচ্ছায় রাজ পথে নেমে যায়। বলতে গেলে তখনই ঐতিহাসিক

অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই ভাষণটি বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছে। এর আগে ১ মার্চ ইয়াহিয়ার ভাষণে শুধু জাতিকে উত্তেজিতই করেছে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেনি। এই ভাষণে জাতিকে একটি গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে, জাতিকে সঠিকভাবে আবেগদীপ্ত করেছে, উজ্জীবিত করেছে, দেশমাতৃকার দেবিতে আত্মাহুতি দেবার পবিত্র প্রেরণায় প্রস্তুত করেছে। মানুষের জীবনতো একটাই, তা চলে গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। তাই মানুষ তার জীবনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। কবি যখন বলেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, তখন জীবনকে ভালোবাসার কথাই বলেন। সেই মূল্যবান, একমাত্র জীবনটাও মুক্তি যোদ্ধারা হাসতে হাসতে দিয়েছেন, তার পেছনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রাণবন্ত প্রেরণা কাজ করেছে। বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ড. আনিসুজ্জামান ৭ মার্চের ভাষণ প্রসঙ্গে এভাবে তার মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন ৭ মার্চের বক্তৃতা তাই আমরা শুনতে পেলাম ৭ মার্চে। কী আসাধারণ ভাষণ। সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তখনই মনে হলো, পৃথিবীর বুকে একটি নতুন জাতির জন্ম হলো।' (আমার একাত্তর, পৃ. ২৪, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭)।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দু-জন পণ্ডিত : সৈয়দ মুজতবা আলী ও ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, তারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি নিজ কানে শুনেছেন বেতার মারফত। ড. সুনীতি কুমার লক্ষ করেছিলেন, ভাষণটির এক জায়গায় সমার্থবোধক দুটো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, তোমাদের উপর-কাছে, অনুরোধ রইলো...। এখানে উপর অথবা কাছে ব্যবহার করলেই চলতো। ড. সুনীতি কুমার মত প্রকাশ করেছেন যে, মহাভারতে আছে, অর্জুন যুদ্ধে যাওয়ার সময় এমন একটি বীরত্বব্যঞ্জক তরঙ্গে একাধিক সমার্থবোধক শব্দ এসে পড়েছে। এতে দোষ কিছু হয়নি, বক্তৃতার মহিমা ক্ষুণ্ন হয়নি, দ্ব্যর্থকতা ঘটেনি।

আমাদের সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক এক বক্তৃতায় বলেছেন, আমাদের জীবন ধন্য যে, আমরা জীবদ্দশায় এমন একটি ভাষণ শুনতে পেলাম। সৈয়দ হক এক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছিলেন, ভাষণটিতে বঙ্গবন্ধু কতবার এবং কেনো রক্ত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভাষণের প্রথমেই তিনি বললেন, 'কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।'

লক্ষ করা যাবে, এখানে 'রক্ত' শব্দ দিয়ে অনুপ্রাস অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'রক্তে রাজপথ রঞ্জিত'। বক্তৃতাটি শেষও করেছেন এই কথা বলে, 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। সেই রক্ত-ই এসে পড়লো। শুরু করেছিলেন মধ্যম পুরুষে, আপনারা, বলে।

শেষ করলেন মনে রাখবা বলে। এই উঠা-নামা হয়েছে আত্মবিশ্বাসের স্বরাঘাতে। নেতাজী বলেছিলেন, তোমরা রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেবো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিজেই দায়িত্ব নিয়ে উত্তম পুরুষে বলেছেন, রক্ত যখন দিয়েছি... নেতাজীর কথায় শর্তযুক্ত ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কথায় প্রবল আত্মবিশ্বাস, তাই আপনি থেকে তুমিতে রূপান্তর ঘটেছে। এই ভাষণে আছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। তাই বলেছিলেন, সংখ্যায় একজন হলেও ন্যায্য কথা তিনি শুনবেন। এই ভাষণে আছে শিষ্টাচার, তাই ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন, দেখে যান কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। এই ভাষণে আছে মানবতাবাদ, তাই বলা হয়েছে, এই দেশে বাঙালি নন বাঙালি সকলেই আমাদের ভাই। এই ভাষণে ধর্মীয় মূল্যবোধকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেছেন, এই ভাষণেই স্বাধীনতা ঘোষিত হয়ে গেছে, তবে বঙ্গবন্ধু শব্দচয়নের কৌশল হিসেবে বলেছেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। যদি বলতেন, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, সেটা হতো হঠকারিতা, তাতে মহাবিপর্যয় ঘটতো।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ : একটি হিরণ্ময় স্বপ্নের স্রষ্টা

জাহীদ রেজা নূর

কেমন ছিল একাত্তরের ৭ মার্চ দিনটি? ওই যে দলে দলে রেসকোর্স ময়দানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকা মানুষ, তারা কি জানত, কী বলবেন সেদিন বঙ্গবন্ধু? সবার মনে ভেসে বেড়াচ্ছে একটিই প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু কি আজ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন? তিনি কি তার ভাষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দেবেন?

রাজনীতির মাঠ তখন উত্থাল-পাতাল। অতি উৎসাহীরা এখনই চায় স্বাধীনতার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু বিরোধীরাও মনে করে, এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান যদি বড় একটা ভুল করেন, তাহলে তাকে হটিয়ে দেওয়া যাবে রাজনীতির ময়দান থেকে। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী অপবাদ দিয়ে শেষ করে ফেলা সহজ হবে। তাই বঙ্গবন্ধুর দুই দিকেই বিপদ। হাঁটতে হচ্ছিল তাকে সংকীর্ণ একটি পথ ধরে। যেন পুলসিরাত দিয়ে পাড়ি দিতে হচ্ছে পথ, অথবা হতে হচ্ছে বৈতরণী পার।

৭ মার্চ একটি ভাষণে গড়ে দেওয়া হয় জাতির ললাট লিখন। নানা ঘটনার ধারাবাহিকতার নানা স্রোত এসে তৈরি করেছিল দিনটি। তারই কিছু কথা হোক। তারই পথ ধরে ৭ মার্চে পৌঁছানো সহজ হবে।

মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, সত্তরের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল ১৬৭টি আসন। ভুট্টোর পিপলস পার্টি ছিল ৮৮টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। আর কোনো দলই দুই অঙ্কের আসন পায়নি, শুধু স্বতন্ত্র আসন ছিল ১৪টি।

প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল ২৯৮টি আসন। এ রকম গণজাগরণের কথা কি চিন্তা করতে পেরেছিলেন ইয়াহিয়া খান কিংবা তার গোয়েন্দা দল? পারেনি।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ৯ ডিসেম্বর শেখ মুজিব দেশবাসীর উদ্দেশে এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের জনগণ এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করিয়াছে। তাহারা এক অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাহাদের এই রায় প্রদানের অধিকার অর্জন করিয়াছে।... আওয়ামী লীগের বিরাট বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের বিজয়।...(দৈনিক সংবাদ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭০)।

১১ ডিসেম্বর দেশের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিতে বলেন, 'এই প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের জনগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সুযোগ পেয়েছে। উত্তেজনা ছিল অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু জাতি যে সুশৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।... (দৈনিক পাকিস্তান, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭০)।

১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। তিনদিন ছিলেন এখানে। তাতে দুই দফা শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক হয় তার। প্রেসিডেন্ট বলেন, 'শীঘ্রই দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার গঠিত হইবে এবং শেখ সাহেব দেশের প্রধানমন্ত্রী হইতে যাইতেছেন।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭১)। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

পুরো বাংলায় কিন্তু তখন চলছে উৎসব। চলছে মিছিল। সংগীত শিল্পীসমাজ সংবর্ধনা দিলো শেখ মুজিবকে। শেখ মুজিব সেখানে বললেন, 'বাংলার মাটিতে ভাড়াটিয়া তাহজিব তমদ্দুন আমদানির দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। বাংলার মানুষকে, নিজস্ব সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশকে আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না।'... সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীতসেবীদের উদ্দেশে আমি বলিতে চাই, বাংলার মাটি ও মানুষকে, বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করিয়া নিজস্ব সাহিত্য-কৃষ্টি সংস্কৃতির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন। ভয় নাই, বাংলার সাত কোটি মানুষ আপনাদের সঙ্গে আছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭১)।

১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ৩ মার্চ। বসবে ঢাকায়। কিন্তু ভুট্টো ঢাকায় এসে অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকার করলেন। এরপর কাইয়ুম খানের মুসলিম লীগও ভুট্টোর সঙ্গে হাত মেলাল। অর্থাৎ অধিবেশন নিয়ে ষড়যন্ত্র হলো শুরু।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কাছাকাছি পৌঁছাতে হলে সে সময়টিকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। বুঝতে হবে, একটি জাতির আকাঙ্ক্ষার মূলে তখন কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। জনগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখে, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে অন্ধকারের মধ্যে রেখে ইয়াহিয়া-ভুট্টো মিলে তখন গড়ে তুলেছেন ষড়যন্ত্রের জাল।

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি—চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন। বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়, লাঞ্ছিত-অপমানিত না হয়। দেখবেন, শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। যতোদিন বাংলার আকাশ-বাতাস-মাঠ-নদী থাকবে, ততোদিন শহীদেরা অমর হয়ে থাকবে। বীর শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে, বাঙালি তোমরা কাপুরুষ হয়ো না, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বাধিকার আদায় করো। বাংলার মানুষের প্রতি আমার আহ্বান—প্রস্তুত হোন, স্বাধিকার আমরা আদায় করবই। (দৈনিক পাকিস্তান, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১)।

বঙ্গবন্ধু প্রস্তুত হচ্ছিলেন দেশের ভাগ্য গড়ার জন্য। ইয়াহিয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিলেন। ১ মার্চ একটা পাঁচ মিনিটে পাকিস্তান বেতারে দেওয়া ভাষণে ইয়াহিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিলেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন।

বারুদে আগুন লাগা বুঝি একেই বলে। প্রথমে ফুঁসে উঠল ঢাকা, তারই পথ ধরে পুরো বাংলা নামের দেশটা। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়; শ্রমিক, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী প্রত্যেকেই নেমে আসেন রাস্তায়। ঢাকা তখন মিছিলের নগরী। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ উত্তাল ঢাকা গড়ে তোলে মহাকাব্য। হোটেল পূর্বাণীতে তখন চলছিল আওয়ামী লীগের বৈঠক। পার্টির কাজ সংক্ষিপ্ত করে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বঙ্গবন্ধু। ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে জনসভার কথা ঘোষণা করেন তিনি। বলেন, এই জনসভায় তিনি পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

প্রতিদিনই মিছিল, হরতাল। রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেন মুজিব। পূর্ববাংলা তখন চলছে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে।

অতঃপর ৭ মার্চ, অতঃপর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ। অতঃপর একটি ভাষণের কবিতার ব্যঞ্জনা পাওয়া। জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যে

শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন, তা কোনো লিখিত বক্তব্য নয়। কবির মতো, দ্রষ্টার মতো তিনি একটি ভাষণে একটি জাতির স্বপ্ন বুনে চললেন। এই হিরন্ময় স্বপ্ন যুগ থেকে যুগে বাঙালির মনে জোগাবে অনুপ্রেরণা। স্বপ্ন বাস্তব হবে। এই ভাষণের পথ ধরেই আবার আসবে নতুন স্বপ্ন। নতুন সে স্বপ্নও বাস্তব হবে...।

তিনি অতিবিপ্লবীদের উগ্রতার রাশ টেনে ধরলেন। নিজেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে পরিচিত না করায় সুযোগসন্ধানীদের হতাশ করলেন। আর জাতি, বাঙালি জাতি, বাংলায় বসবাস করা সব মানুষ দেখল, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দৃপ্ত এই লোকটির পুরো অবয়বে কবিত্ব ভর করছে। তিনি বাংলাদেশ নামক অমর কবিতাকে হৃদয়ে লালন করেছেন সযতনে।

প্রথম আলো : ৭ মার্চ ২০০৯

৭ মার্চের ভিন্নতর পাঠ

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তান রাষ্ট্রে কলোনিয়াল টর্চার সাবেক পূর্ব পাকিস্তান কিংবা পূর্ববাংলায় চূড়ান্তে পৌছে ছিল। একপক্ষে রাষ্ট্রের সশস্ত্র ক্ষমতা, অন্যপাশে পূর্ববাংলার নিরস্ত্র জনসাধারণ পরস্পরের সম্মুখীন। একপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্র পূর্ববাংলায় তার কলোনি অব্যাহত রাখার জন্য উদ্যত, অন্যপক্ষে পূর্ববাংলার জনসাধারণ কলোনি ভেঙে দিয়ে স্বাধীনতার দিকে অগ্রহসরমান। এই পরিস্থিতিতে প্রমাণ করেছে মানবিক অধিকারের সমস্যা। অধিকার সীমারেখা তৈরি করে যার পরপারে কোনো সরকারের যাওয়া উচিত নয়। পূর্ববাংলার সমাজ কলোনিয়াল টর্চার প্রত্যাখ্যান করে সমাজভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা এবং মানবিকতা স্পষ্ট করেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র টর্চারকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে রাষ্ট্রটিকে টেররিস্ট করার সকল প্রক্রিয়া চূড়ান্তে নিয়ে এসেছে। যে রাষ্ট্র টেররিস্ট হয়ে ওঠে, সে রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার থাকে না। জ্ঞানের দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই সমস্যা ৭ মার্চের ভাষণে বিশ্লেষণ করেছেন, টর্চারভিত্তিক টেররিস্ট রাষ্ট্রের কনসেপ্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ফ্রিডম হচ্ছে সকল সমস্যার সমাধান সেই কথাটি বলেছেন। তাঁর বলা এবং সাধারণ মানুষের বোধ এই ক্ষেত্রে মিলেছে। এই প্রক্রিয়ায় এই ভাষণটি অনন্য এক ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

এই দলিলটির অন্য একটি দিক আছে। এই মুহূর্তে এই দিকটির গুরুত্ব দূরস্পর্শী ও অপরিসীম। ভাষণটিতে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যের দূরত্ব, যারা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যাদের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ভার বহন করতে হয়– এই দুই পক্ষের মধ্যেকার নারকীয়তা সম্পর্ক রাষ্ট্রের চরিত্র উন্মোচিত করে। একদিকে আছে দরিদ্রজন তাদের রাষ্ট্রের কেন্দ্রে যাওয়ার পথে আছে

মিথ্যা, পাশবিকতা এবং অন্যায়। অন্যদিকে আছে সশস্ত্র বাহিনী যারা ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে সেনা সমর্থিত ফখরুদ্দীন সরকারের আমলে। তারা বর্তমান মুহূর্তে ক্রুদ্ধ, ক্ষমতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে ফের ফিরে আসতে তৎপর। মার্চ ১৯৭১-এর ইতিহাস এই প্রক্রিয়ায় আবার যদি পাঠ করি, তাহলে আমরা ইতিহাসের অর্থ বিভিন্নভাবে : ক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনদের দ্বন্দ্বের পরিসরে বুঝতে পারব।

ক্ষমতার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বিশ্লেষণ করা জরুরি। যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং যাদের ক্ষমতা মেনে নিতে হয় দুয়ের মধ্যে তফাৎ যুগান্তরের। এই তফাৎ অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সশস্ত্র শক্তির ক্ষমতা কিংবা আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা কিংবা রাজনৈতিক চাটুকারদের ক্ষমতা, যাদের ক্ষমতা নেই তাদের বিরুদ্ধে। সেজন্য দেখি এদের মধ্যে যারা কিংবা কোনো একপক্ষ ক্ষমতাসীন তারা দরিদ্রদের শহর থেকে উৎখাত করতে সচেষ্ট, কিংবা যারা গার্মেন্টসে কাজ করেন তাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে ব্যস্ত। মালিকপক্ষ কত মুনাফা করেন এবং শ্রমিক পক্ষ কত মজুরি পান, এই তথ্য জানানো হয় না। বরং পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে কিংবা গুণ্ডা লেলিয়ে, শ্রমিকদের বাড়িঘর তছনছ করে শ্রমিক নারীদের ইজ্জত নষ্ট করে ক্ষমতার রাষ্ট্রিক দিক ক্ষমতার পক্ষ খুলে ধরেন।

ক্ষমতা প্রবল হলে সিভিল লিবার্টি আক্রান্ত হয়। এটাই আমাদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা। সশস্ত্র শক্তির নিরাপত্তা কিংবা আমলাতান্ত্রিক সাধারণ মানুষের লিবার্টি নষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের লিবার্টি আমাদের কাম্য ও লক্ষ্য। এখানেই কেন্দ্রীভূত মানুষী মর্যাদা। এই মর্যাদা নষ্ট হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি শক্তি ব্যবহারকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ও রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার এই দিকটির ওপর জোর দিয়েছেন।

রাষ্ট্রের ভেতর টেরোরিস্ট উপাদান জড়ো হয়, যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দায়বদ্ধতার বোধ উধাও করে দেয়া হয়। টেররিস্ট উপাদান ও সিভিল লিবার্টি পাশাপাশি চলতে পারে না। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রের ভেতরে টেরোরিস্ট উপাদান জড়ো হয়েছিল এবং সিভিল লিবার্টি পিছু হটে গিয়েছিল। সে জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে গণহত্যা সম্ভব হয়েছিল। গণহত্যা এবং নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসাবাদ ব্যবহৃত হয়েছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের আগেই এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে তীব্র প্রখর প্রশ্ন তুলেছিলেন।

ক্ষমতা ও ক্ষমতাহীনদের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে এই পরিসর বোঝা জরুরি হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতা কিংবা ক্ষমতাহীনদের নিরাপত্তাহীনতা গণতন্ত্রের প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকি এবং এই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে সংক্রমিত হয় কর্তৃত্ববাদ কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা, যা কিনা আমরা দেখেছি সশস্ত্র শক্তির মধ্যে, জবাবদিহিহীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের এই পাঠ বৈধ বলে মনে হয়।

যদি এই পাঠ প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে কতগুলো প্রশ্ন ওঠে এবং এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমাদের খুঁজতে হবে : কোন ধরনের রাষ্ট্র এটি? কারা এই রাষ্ট্রের মালিক? কারা এই রাষ্ট্র পরিচালনা করে? এসব প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমলে উত্থাপন করেছিলেন এবং আমরা এই সময়ে এসব প্রশ্ন উত্থাপন করছি।

জনকণ্ঠ : ৭ মার্চ ২০০৯

সেই কবি, সেই কবিতা

ড. আতিউর রহমান

'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

—বঙ্গবন্ধু; রেসকোর্স ময়দান, ৭ মার্চ, ১৯৭১

আজ ৭ মার্চ। এক অর্থে বাংলাদেশের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দিনগুলোর একটি। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে বাইরে রাখার হীন উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। সারা বাংলাদেশ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ। সারা বাংলাদেশে প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বাঁধে। বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র নেতৃত্বে পুরো বাঙালি জাতি একাট্টা হয়ে যায়। দলমত নির্বিশেষে তিনি কার্যত বাংলাদেশের পরিচালনা ভার হাতে নিয়ে নেন। শুরু করেন অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনেরই একপর্যায়ে ৭ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। সারা বিশ্ব অনুমান করেছিল যে, তিনি হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করে দেবেন। কিন্তু তিনি সেদিন 'প্রায়-স্বাধীনতাই' ঘোষণা করলেন। পাকিস্তানিদের শেষ সুযোগ দিলেও কার্যত তিনি সেদিন স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বেরই জানান দিলেন। জনআকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সেদিন এমন এক বক্তৃতা দিলেন যা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে আজ স্বীকৃত। সেদিন তিনি যেভাবে জনসমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন তা যেন এক অমর কবির ভাবগম্ভীর পদার্পণ। আমাদের সাহিত্য জগতের অন্যতম উজ্জ্বলতম কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষা তিনি সেদিন এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে। তাঁর বজ্রকণ্ঠের বাণী জনসমুদ্রে যে আন্দোলন তুলেছিল তা যেন আজও শেষ হবার নয়।

"... শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা।
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি
শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি;
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।"

-নির্মলেন্দু গুণ, 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো'

পঞ্চাশ-উত্তর পুরোটা সময় রাজনৈতিক-সামাজিক-নান্দনিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশনা, অঙ্গুলি হেলন, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভঙ্গীই প্রভাবান্বিত করেছে সদ্যোজাত বাঙালি জাতিকে। সেই অর্থে '৭১-এর ৭ মার্চের কালজয়ী সেই ভাষণটিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ এক রাজনৈতিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের মতো দীঘলদেহী এই শ্রেষ্ঠ বাঙালির সেদিনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। এই ভাষণেই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম রাজনীতির এই অতুলনীয় কবির আবেগ, গরীবের প্রতি মমত্ববোধ, চরম উত্তেজনাময় পরিবেশেও সংযত থাকার পরিমিতিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের শেষ পরিণতি সার্বিক মুক্তির আহ্বান : "...রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রতি তাঁর লোভ নেই। তিনি চান মানুষের অধিকার। এই

ভাষণেই তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি ছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষেরই অংশ। ঐতিহ্যের সন্তান।

'দাবায়ে রাখতে পারবা না'র মতো আঞ্চলিক ভাষা ও অনুভূতির মিশেলে এমনি সাহসী উচ্চারণের কারণেই তাঁর ঐ ভাষণটিকে রাজনীতির এক মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন অনেকে। এমন মহাকাব্য একদিনেই তৈরি হয় না। মাটি-ঘেঁষা রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি নিরন্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার জন্যই তিনি এমন অনুপম এক হৃদয়কাড়া রাজনৈতিক কবিতা লক্ষ-কোটি মানুষের সামনে সেদিন ওভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন।

ওই কবিতায় তিনি বাঙালির হাজার বছরের ক্ষোভ ও স্বপ্নের নির্যাস তুলে এনেছিলেন। একেকটি শব্দ যে একেকটি যুগের প্রতিধ্বনি। সাত কোটি বাঙালির দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনা তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। সেই দুঃখ, বঞ্চনা ও অপমানকে আত্মস্থ করে এমনভাবে শব্দের সঞ্চার করেন যা বাঙালির ইতিহাসে কখনও লক্ষ করা যায়নি। সেদিন তিনি বাঙালির স্বাধীনতার নানামাত্রিক আকাঙ্ক্ষা অন্তরের গভীরতম তল থেকে উৎসারিত করেছিলেন। পুরো বক্তৃতায় তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইঙ্গিতই দেননি; একই সাথে অর্থনৈতিক মুক্তির নানা দিকও সেদিন তাঁর ভাষণে ফুটে উঠেছিল। তাঁর সেই বক্তৃতাটি ছিল আসলে একটি রণকৌশল। শুধু পাকিস্তানি দুশমনদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের আভাসই তিনি সেদিন দেননি। দিয়েছিলেন কী করে গরিব-দুঃখী বঞ্চিত মানুষের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে তা থেকে মুক্তির পথ সন্ধানেরও ইঙ্গিত। শুরুই করেছিলেন মুক্তি শব্দটি দিয়ে। 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' একথা বলার পরপরই তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। তিনি আশা করেছিলেন জাতীয় সংসদ বসবে। জাতীয় পরিষদের সদস্যরা শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। সেই শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে "এদেশকে আমরা গড়ে তুলব, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। পরক্ষণেই তিনি ফিরে যান বঞ্চনার ইতিহাসে। গর্জে ওঠেন, ...২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।" এরপর এক নিঃশ্বাসে তিনি বাঙালিকে ক্ষমাতর বাইরে রাখার ইতিহাস তুলে ধরেন। চুয়ান্নতে নির্বাচনে জিতেও কেমন করে বাঙালিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় সেখান থেকে শুরু করে আটান্ন, ছেষট্টি ও ঊনসত্তরের কথা বলেন। এরপর আবার তুলে ধরেন নিরীহ বাঙালির ওপর গুলির কথা। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, "...আমরা পয়সা

দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরীব-দুঃখি-আর্তমানুষের বিরুদ্ধে।" শহীদদের রক্ত পাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধু কোনো আলোচনায় যেতে রাজি ছিলেন না। একই সঙ্গে নিঃস্বার্থ বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দেন, 'প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' হরতালে গরীব মানুষের খুব কষ্ট হয়। সে কথা তিনি জানতেন। তাই রিক্সা-গরুর গাড়ি, রেলগাড়ি, লঞ্চ চলার ঘোষণা দেন। অফিস আদালত চলবে না। মালিকদের হরতালে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের বেতন দিতে বলেন। গরিব কর্মচারীর যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য তিনি ব্যাংক দু'ঘণ্টা খুলে রাখতে বলেন যাতে তারা বেতন নিতে পারেন। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে চালু রাখেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে যাতে টাকা না পাঠানো যায় সে ব্যবস্থা করতে বলেন। সরকারি কর্মচারীদের বুঝিয়ে দেন বাংলাদেশ তখন কার নিয়ন্ত্রণে। তিনি বলেন, "আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত এই দেশের মুক্তি না হবে ততোদিন খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো।' অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙ্গালি বিভেদ ভুলে যেতে বলেন। আসল রণকৌশল হিসেবে গেরিলা যুদ্ধের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিলেন সেদিন। 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।... সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।...মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।"

পুরো ভাষণে মুক্তি শব্দটি বারে বারে এসেছে। শেষ করেছেন এই বলে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতায় সংগ্রাম।' কোন্ সেই মুক্তি? নিশ্চয় সে মুক্তি শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তা যে ছিল না তা তাঁর সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোতে অনুরণিত হয়েছে। (দেখুন, আতিউর রহমান, ২০০৯, শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম, দীপ্তি প্রকাশনী)। তার অন্তরের বহুমাত্রিক সেই মুক্তির ধারণা সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও স্থান পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।' (দেখুন, বিচারপতি গোলাম রাব্বানী, ২০০৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান : সহজপাঠ, সমন্বয়, পৃ. ৩০)।

স্বাধীনতার বহুমাত্রিকতা নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা করেছেন নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তিনিও মনে করেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা বা মুক্তির ভাবনার তল ছিল খুবই গভীরে। তাঁর মতে, "বঙ্গবন্ধুর উৎসাহ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সভ্যতা, সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা, সব মানুষের মানবাধিকারের স্বীকৃতি।" (দেখুন, নজরুল ইসলাম সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, ২০০৭, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স)।

এমন উজ্জ্বল এক ভাষণেই দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের। বাঙালি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এমন এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিল যা সকল বিচারেই অতুলনীয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আক্ষরিক অর্থে জনযুদ্ধ। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সন্তানের রক্তে ভেজা বাংলাদেশের লাল সূর্য পতাকা খামচে ধরেছিল যুদ্ধাপরাধী শকুনের দল। সেই খামচি থেকে আজও রেহাই পায়নি আমার প্রিয় পতাকা। তারা বঙ্গবন্ধু, চার নেতাসহ জাতীয় অনেক নেতৃবৃন্দকে শারীরিকভাবে হত্যা করেছে। রক্তের সেই হোলিখেলা আজও শেষ হয়নি। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুকন্যার নেতৃত্বে ফের যখন বাংলাদেশ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে তখন আবার এসেছে আঘাত। এই আঘাত প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যে নিরন্তর যুদ্ধ। এ যুদ্ধের শেষ নেই। তাই পুরো জাতিকে সদা সতর্ক থাকতে হবে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। ২৫ ফেব্রুয়ারি রক্তের যে হোলি খেলা খেলেছে রাষ্ট্রদ্রোহীরা তাতে দেশের সামরিক বাহিনীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা থেকে জাতি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সবাইকে এই দুঃসময়ে সতর্ক থাকতে হবে। সচেতন থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী সেই ভাবনাই আজও আমাদের দিকনির্দেশনা দিতে পারে কী করে এই ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে জাতি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আবারও প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার সময় এসেছে। বাঙালির বহুমাত্রিক মুক্তির সংগ্রাম চলছে। চলবে।

জনকণ্ঠ : ৭ মার্চ ২০০৯

যে ভাষণ স্বাধীনতা এনে দেয়
মোহাম্মদ শাহজাহান

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্য ভাষণ দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুধু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাসেও একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। কারও কারও মতে, এই ভাষণ আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ ভাষণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পাকিস্তানের প্রবল পরাক্রমশালী সামরিক জান্তার কামান-বন্দুকের মুখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে সেদিন প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই ভাষণ একদিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে অনেকের বিশ্বাস।

৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর তৎকালীন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান '৭১-এর ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি নেতা জেড এ ভুট্টো এবং পাকিস্তন সামরিক চক্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন সামরিক প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খান। '৭১-এর পহেলা মার্চ ১টা ৫ মিনিটে আকস্মিক এক বেতার ঘোষণায় ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বাংলাদেশ (পূর্বপাকিস্তান)। বেতারের ঘোষণা শুনে রাস্তায় নেমে আসেন মানুষ। সে সময় ঢাকায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক চলছিল। হাজার হাজার কিক্ষুব্ধ মানুষ নেতার নির্দেশের জন্য মিছিল সহকারে হোটেল পূর্বাণীতে সমবেত হন। জনতাকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল আহবান করেন।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রলীগের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ওই সভায় প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায়। লাল-সবুজের এই পতাকায় হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল। স্বাধীনতার পর জাতীয় পতাকায় দেশের মানচিত্র না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩ মার্চ বুধবার পল্টনে ছাত্রলীগের সভায় অনির্ধারিতভাবে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হন। ওই সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ছিল দৃশ্যমান। বঙ্গবন্ধুকে তাঁর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা ঘোষণা করে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন পদাধিকারবলে ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। পল্টনে ছাত্রলীগের এই সভায় বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণ করা হয়। সভায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।

পল্টনে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সভায় প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি না থাকলে– আমার সহকর্মীরা নেতৃত্ব দিবেন। তাদেরও যদি হত্যা করা হয়, যিনি জীবিত থাকবেন, তিনিই নেতৃত্ব দিবেন। যে কোনো মূল্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে– অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধু আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ৭ মার্চ রোববার রেসকোর্স ময়দানে তিনি পরবর্তী কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন। ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত সারাদেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে আন্দোলন এগিয়ে চলল। সারাদেশে তখন একজন মাত্র নেতা। তিনি হচ্ছেন দেশের শতকরা ৯৮ জন মানুষের ভোটে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের সামরিক শাসন চালু থাকলেও সামরিক সরকারের কথা তখন কেউ শুনছে না। শেখ মুজিবের কথাই তখন আইন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সমগ্র বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে। সেই আন্দোলনমুখর পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসলো ৭ মার্চ। সবার দৃষ্টি ৭ মার্চের দিকে। আর এমন এক কঠিন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ মার্চে রেসকোর্সে তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষকে চারটি শর্ত দিয়ে ভাষণের শেষাংশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন,

"এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু অংশ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, তিনি সেদিন যুদ্ধের ঘোষণা যেমন পরোক্ষভাবে প্রদান করেন– আবার যুদ্ধে কিভাবে জয়ী হতে হবে সে ব্যাপারেও বক্তব্য রাখেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইলো প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

প্রকৃতপক্ষে '৭১-এর পহেলা মার্চ থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের শাসন কায়েম হয়। যে জন্য তিনি বলতে পেরেছেন, ২৮ তারিখ কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। তিনি পাকিস্তানি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলারও আহ্বান জানান। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা হতে পারে। যে জন্য তিনি ঘোষণা করেন, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা রাস্তাঘাট সবকিছু বন্ধ করে দিও। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও শত্রু পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ অব্যাহত থাকে– ৭ মার্চের ভাষণে তাই তিনি বলেছেন। তাছাড়া ভাতে মারবো, পানিতে মারবো- এই কথার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পর্যুদস্ত করার কথাই বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে সময় এমন ছিল যে, কোনো কোনো বিদেশি পত্রিকাও তখন জানিয়েছিল– ৭ মার্চ শেখ মুজিব হয়তো পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। '৭১-এর ৫ মার্চ লন্ডনের গার্ডিয়ান সানডে টাইমস, দি অবজারভার এবং ৬ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বাভাস দেয়া হয়। ৬ মার্চ, '৭১ লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ছাপা হয় "East Pakistan UDI (Unilateral Declaration of Independence) Expected. Sheikh Mujibur Rahman expected to declare independence tomorrow. অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল (৭ মার্চ) পূর্বপাকিস্তানের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব '৭১-এর ৭ মার্চ সরাসরি কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, তার ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে তিনি নিজেই দিয়েছেন। ১৯৭২-এর ১৮ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্রিটিশ সাংবাদিক

ডেভিড ফ্রস্টকে এনডাব্লিউ টিভির জন্য দেয়া এক সাক্ষাতকারে ৭ মার্চের ওই কাহিনী বর্ণনা করেন। ফ্রস্ট শেখ মুজিবের কাছে জানতে চান, 'আপনার কি ইচ্ছা ছিল যে, তখন ৭ মার্চ রেসকোর্সে আপনি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা দেবেন?' জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি জানতাম এর পরিণতি কী হবে এবং সভায় আমি ঘোষণা করি যে এবারের সংগ্রাম মুক্তির, শৃঙ্খল মোচন এবং স্বাধীনতার।' ফ্রস্ট প্রশ্ন করেন, 'আপনি যদি বলতেন, আজ আমি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা করছি, তো কি ঘটত?' শেখ মুজিব উত্তর দেন, 'বিশেষ করে ওই দিনটিতে আমি এটা করতে চাইনি। কেননা, বিশ্বকে তাদের আমি এটা বলার সুযোগ দিতে চাইনি যে, মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং আঘাত হানা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। আমি চাইছিলাম তারাই আগে আঘাত হানুক এবং জনগণ তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।'

ইতিহাস প্রমাণ করে– ৭ মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করে বঙ্গবন্ধু শতভাগ সঠিক কাজটিই করেছেন। ২০০৬ সালের ৩১ মার্চ আইয়ুব খান নামের একজন কলাম লেখক দৈনিক ভোরের কাগজে যথার্থই লিখেছেন, "বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের একটি শব্দ বা দাড়ি-কমাতেও বাহুল্য ছিল না। প্রতিটি শব্দ বা বাক্য বাস্তবতার গভীর থেকে উৎসারিত। এ যেন কোনো দেবদূত, সমবেত জনতাকে তাদের সঙ্কটকালে অমোঘ নিয়তির দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন।" কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, বঙ্গবন্ধু যেমন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন– কালের পরিক্রমায় তাঁর ৭ মার্চের ভাষণও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

জনকণ্ঠ : ৭ মার্চ, ২০০৯

৭ মার্চ আমাদের ডি ফ্যাক্টো স্বাধীনতা দিবস
যাহা বলিব সত্য বলিব

সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ আজ। ১৯৭১ সালের এ দিনে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার সামনে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ ভাষণ নিয়ে আলোচনার পূর্বে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনে দুটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ। এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিজের গৌরব বৃদ্ধি করে। আবার এ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দাও লুট করা যায়। যে কারণে যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা গোলাম আযম দাবি করেন তিনি ভাষাসৈনিক। আবার মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে চরমভাবে ধ্বংস করেছেন। তিনি দালাল আইন বাতিল করেছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছেন, তাদের অনেককে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছেন। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান আতিকুজ্জামান খানকে কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার পদে নিয়োগ দিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি সরকারি পদে আসীন থেকে রাজাকার ও দালালদের সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর শুরু হয় ইতিহাস বিকৃতির। বহু খলনায়কের আমদানি করা হয়। জেনারেল জিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন ১১ সেক্টরের একটি সেক্টর কমান্ডার।

২৬ মার্চ, '৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র কয়েকদিনের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। যদিও ঘটনাটি সত্যি ছিল না, তবুও তাৎক্ষণিকভাবে এর একটা মূল্য ছিল। যেমন বারবার

ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল, কুখ্যাত পাকিস্তানি জেনারেল টিক্কা নিহত হয়েছে। আমরা খবরটি শুনে লাফিয়ে উঠেছিলাম। এই প্রচার প্রক্রিয়ার একপর্যায়ে ২৭ মার্চ, '৭১ জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করে শোনান। জেনারেল জিয়া '৭৮ সালে বিজয় দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছিলেন যে '৭১-এর ২৭ মার্চ তিনি জাতিকে এই আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা যার ভেতর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি রয়েছেন, তারা আবিষ্কার করলেন যে জিয়া ২৬ মার্চে এই ঘোষণা দিলেন। গোটা জাতি কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শায়িত ছিলেন, জিয়ার আহ্বানে লাফ দিয়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। আমার এক বন্ধু মাঝে মাঝে আমাকে বলতো যে, তার আতঙ্ক যে কবে যেন এই জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা বলে বসেন যে জিয়া কার্জন হলের প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্ব কিন্তু বিভ্রান্ত হয়নি।

এখন পর্যন্ত সমসাময়িক কালের যে কটি বিদেশি ইতিহাস চোখে পড়েছে, সেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে যে শেখ মুজিবের আহ্বানে এবং নেতৃত্বে বাংলাদেশ যুদ্ধ করেছে এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই আহ্বান জানাবো যে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এই শব্দ দুটি যে অবিভাজ্য, তা বোঝার জন্য অল্প কয়েকটি জিনিস লক্ষ করলেই হবে। প্রথমত আওয়ামী লীগের ছয় দফা। এই ছয় দফা যে পাকিস্তানি জেনারেলদের আতঙ্ক, তা পাকিস্তানি এক জেনারেল যিনি '৭১ সালে পাকিস্তানের জঙ্গি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পিআরও ছিলেন। ভদ্দরলোকের নাম জেনারেল এ আর খান। তার বইটির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে পাকিস্তানি সমর পরিচালক জেনারেলদের তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে মুজিবকে জাতীয় পরিষদে ঢুকতে দেয়া হলো না কেন? এর উত্তরে তারা বলেছিলেন যে মুজিব একবার জাতীয় পরিষদে ঢুকলে ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন এবং পাস করে তারপর বেরিয়ে আসবেন। ছয়দফার কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি। পাকিস্তানের দুই অংশে সহজে বিনিময়যোগ্য দুটো পৃথক মুদ্রা চালু থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান বিদেশিদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করবে এবং বাণিজ্য দপ্তর থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর আরোপ করার ক্ষমতা থাকবে না। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা দেবে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে থাকবে। পূর্বপাকিস্তান সরকার তার নিয়ন্ত্রণে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তুলবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানকে উন্নয়ন কর্মে

ঠকানো হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু '৬৬ সালে ছয়দফা ঘোষণার পর বাংলার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটেছেন এবং জনগণের সামনে ছয় দফা তুলে ধরেছেন। '৭০-এর নির্বাচনের প্রচারকালে তিনি বারবার বলেছেন যে তিনি ছয় দফাকে ম্যান্ডেট হিসেবে উপস্থান করছেন। '৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদের বরাদ্দকৃত ১৬২ আসনের ভেতর ১৬০টিতে আওয়ামী লীগ এককভাবে বিজয়ী হয়। কোনো জোট ছিল না। তিনি পাকস্তানিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ওই ছয় দফা বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে। এরপর নতুন প্রজন্মের কাছে আহ্বান জানাবো বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং কর্ম সম্পর্কে অবহিত হবে। বাংলা একাডেমী ২০০৮ সালে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি' শিরোনামে দুই খণ্ডের একটি জীবনী প্রকাশ করেছে। এর সম্পাদক প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং গবেষক মোনায়েম সরকার। আরো কয়েক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সম্পাদনা এবং প্রামাণ্যকরণ পরিষদে ছিলেন। এরা হলেন সন্তোষ গুপ্ত, গাজীউল হক, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং আশফাক-উল-আলম। এই বইতে বঙ্গবন্ধু ৫৫-৫৬ সালে গণপরিষদে যে ভাষণ দিয়েছিলেন বা যে সব বিষয় উত্থাপন করেছিলেন, তার কিছু উল্লেখ রয়েছে। তখন বঙ্গবন্ধু ৩৫/৩৬ বছরের যুবক। তিনি একদিন পরিষদে উল্লেখ করলেন যে দৈনিক কর্মসূচির যে তালিকা সদস্যদের দেয়া হয়, তা শুধু ইংরেজি এবং উর্দুতে মুদ্রিত হচ্ছে। বাংলায় নয় কেন, অথচ বাংলাও তো অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা। তৎকালীন অনেক প্রবীণ পূর্ব পাকিস্তানি নেতা সদস্য ছিলেন, কিন্তু চ্যালেঞ্জ করেছেন তরুণ শেখ মুজিব। তৎকালে গভর্নরের বেতন ৩০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে গভর্নর বাড়ি, গাড়ি, বাসস্থানের নানা সরঞ্জাম ফ্রি পাওয়ার পরও তাকে কেন এতো বেতন দিতে হবে। তিনি জানিয়েছিলেন যে চীনের নেতা মাও সেতুং মাত্র ৫০০ টাকা বেতন নেন। অবশ্য বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু আরো বলেছিলেন যে পিওনের বেতন মাত্র ৫০ টাকা। ইসলাম কি এই বিশাল বৈষম্য মেনে নেয়?

এই বইতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং গোয়েন্দা সংস্থার কিছু নথিপত্র ছাপা হয়েছে। এসব পড়লে দেখা যাবে যে বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে পাকিস্তানি শাসকদের বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে কিভাবে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে গেছেন, অপরদিকে পাকিস্তানি শাসকরা কীরকম উৎকণ্ঠিত এবং আতঙ্কিত থাকতো তাকে নিয়ে। বঙ্গবন্ধুর লেখা কিছু চিঠি ছাপা হয়েছে এই বইটিতে। তার স্ত্রীকে এবং

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে লেখা এসব চিঠি। পড়লে তার হৃদয়ের বহু অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন মওলানা ভাসানী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন কেননা মওলানা সাহেব রক্তচাপে ভুগছিলেন। তার স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কথা বলেছেন। পিতৃস্নেহের নানাদিক ফুটে উঠেছে। এই পিতৃস্নেহ বৃদ্ধি পেতে পেতে গোটা জাতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মোনায়েম সরকার আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কয়েকজন সুধীকে নিয়ে এ রকম একটি মূল্যবান বই সম্পাদনা করেছেন, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। সেই সঙ্গে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে হয় বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষকে।

এবার ফিরে আসি ৭ মার্চের ভাষণে। সে সময় আমি বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানায় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করছিলাম। '৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন এবং তা প্রচার করা হবে। তখন আমি তরুণ। দারুণ উত্তেজিত। রেডিওর জন্য নতুন ব্যাটারি নিয়ে এলাম। তারপর থানার সব কর্মকর্তা এবং স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে থানা উন্নয়ন কেন্দ্রে বসে রইলাম। প্রচার করলো না পাকিস্তানি শাসক। কিছুক্ষণ রেডিও পাকিস্তানের প্রচার বন্ধ হয়ে গেলো। পরে রেডিও কর্মীদের আপোষ রফা হয়। পরদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে এ রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচার করা হলো। ১৮ মিনিটের বক্তৃতা। তবে মনে হলো এ যেন রাজনীতির অনন্য কাব্যসম্ভার। অপূর্ব শব্দচয়ন। এতোটুকু কৃত্রিমতা নেই। রয়েছে বক্তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নির্গত আবেগ, অনুভূতি, ব্যথা এবং একই সঙ্গে কর্তব্য পালনের দৃঢ় সংকল্প। তিনি জানিয়ে দিলেন যে তিনি যদি আর হুকুম দেয়ার সময় নাও পান, আমাদের কি করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার তিনি কার্যত গ্রহণ করলেন। ৭ মার্চের পর কি আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের শাসন ছিল? উত্তর— না। যেমন আমি সিরাজগঞ্জ মহকুমার কথা বলি। শহীদ শামসুদ্দিন সিএসপি এসডিও সাহেবের নেতৃত্বে আমরা লড়েছি। যতোদিন আমরা একে মুক্ত রাখতে পেরেছি, আমাদের আনুগত্য ছিল বঙ্গবন্ধু তথা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি। এরপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী দখল করে নিয়ে তাদের শাসন চালায়, সেই সঙ্গে চালায় হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং ধর্ষণ। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে আহ্বান জানালেন সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে। প্রত্যেক ইউনিয়নে এবং বড় হাটবাজার এবং গঞ্জে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়। ব্যাংক এবং সরকারি অফিস ৭ মার্চের নির্দেশের আলোকে চলতে থাকে।

'৭১-এর ২৬ মার্চ কাকডাকা ভোরে সিরাজগঞ্জ থেকে এসডিও শামসুদ্দিন সাহেব টেলিফোনে জানালেন যে পাকবাহিনী ঢাকায় বর্বরোচিত হামলা শুরু করেছে। তিনি আরো বললেন যে পাবনার জেলা প্রশাসক নুরুল কাদের খান লড়বেন। শামসুদ্দিন সাহেব জানালেন যে তিনিও লড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও একই সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। টেলিফোনে কথা শেষ করে ধানগড়া বাজারে এসে বসলাম। অল্প সময়ের ভেতর চারদিক থেকে বহু লোক এসে সমবেত হলেন। থানার ওসিকে নির্দেশ দিলাম সব অস্ত্র তরুণদের মাঝে বিতরণ করে দিতে। এরপর যদিও বঙ্গবন্ধুকে বক্তৃতা দিতে দেখিনি, তবুও কল্পনায় তার বডি ল্যাংগুয়েজকে নকল করে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা করলাম। আঙুল দিয়ে থানা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় দেখিয়ে বললাম যে, বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ঐ দপ্তরে বসবো না। আমি আর পাকিস্তান সরকারের কর্মচারী নই। সেদিন রেডিওতে কথা বলার সুযোগ পেলে এসবই পেতাম। আমরা তো তখন পর্যন্ত কারো কোনো ঘোষণা শুনিনি। প্রেরণা পেয়েছি এবং নির্দেশ হিসেবে নিয়েছি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ থেকে। সেজন্য এই এলাকায় শিরোনাম দিয়ছি যে, ৭ মার্চ আমাদের ডিফ্যাক্টো স্বাধীনতা দিবস। আমরা সেদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এডভোকেট নুরুল কাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি বস্তুনিষ্ঠ তথ্যবহুল বই লিখেছেন, একে মিনি এনসাইক্লোপিডিয়া বলা চলে। বইটির নাম '২৬৬ দিনে স্বাধীনতা'। এই বইতে তিনি লিখেছেন যে আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালিত হওয়া উচিত ৭ মার্চ। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাই মনে করি। প্রখ্যাত আইনজীবী এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম সাহেবের কাছে বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। আমার এখন মনে নেই। কি যেন আইনগত জটিলতা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছিলেন। আমরা আমজনতা অনেক সময় বেশি আবেগ দিয়ে হয়তো কথা বলি। আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা আমাদের ঢোকার কথা নয়। তবে আবারো বলবো যে বঙ্গবন্ধুরা ৭ মার্চের ভাষণ অনন্য এবং অসাধারণ। এখনো যতোবার শোনা যায়, তৃষ্ণা মেটে না। মনে হয় আরো শুনি।

ভোরের কাগজ : ৭ মার্চ, ২০০৯